হাজী এ. কে খান কলেজ পত্রিকা

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সীবনী

বার্ষিক সংকলন ২০২২

সীবনী

সাহিত্য পত্রিকা

হাজী এ.কে. খান কলেজ

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

—ঃ হাজী এ.কে. খান কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য ঃ—

।। আগষ্ট ২০১৯ - বর্তমান ।।

১)	হাতেমুল ইসলাম	-	সভাপতি, পরিচালন সমিতি
২)	ডঃ গৌতম কুমার ঘোষ	-	সম্পাদক, পরিচালন সমিতি
৩)	জিল্লার রহমান	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
৪)	অরিন্দম উপাধ্যায়	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
৪)	খোদাবক্স খান	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
৫)	ডঃ সোমা মুখোপাধ্যায়	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
৬)	ডঃ সুকান্ত বিশ্বাস	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
৭)	ডঃ কৃষ্ণেন্দু মুন্সী	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
৮)	ডঃ পুলকেশ মণ্ডল	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
৯)	শ্রীমতি বিদিশা মুন্সী	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি
১০)	হাসানুল ইসলাম	-	সদস্য, পরিচালন সমিতি

সীবনী

সাহিত্য পত্রিকা
হাজী এ.কে. খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক
পুলকেশ মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক
হাজী এ.কে. খান কলেজ

প্রকাশক
গৌতম কুমার ঘোষ

অধ্যক্ষ
হাজী এ.কে. খান কলেজ

প্রকাশকাল
৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

বর্ণবিন্যাস
অমজ্যোতি তালুকদার
মোবাইল : ৯৭৩৪৩১৪৫৫৮

মুদ্রণ
ওম প্রিন্টার্স
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
মোবাইল : ৯৪৩৪২৫৫২১৫

সূচিপত্র

■ অধ্যক্ষের কলমে — পৃঃ ৫

■ সম্পাদকের কিছু কথা — পৃঃ ৯

■ কবিতা —

আমি শিশু - সাবনাজ পারভিন - পৃঃ ১৫ ❖ পাহাড় ভ্রমণের কথা - সাকিল মণ্ডল - পৃঃ ১৬ ❖ মনের ইচ্ছা - ঝর্ণা খাতুন - পৃঃ ১৬ ❖ ভাবনা ও কবি - পরিমল কর্মকার - পৃঃ ১৭ ❖ শিক্ষকের মর্যাদা - দেবজিৎ মণ্ডল - পৃঃ ১৮ ❖ ভারত সন্তান দাবিদার - ওয়াহিদা পারভিন - পৃঃ ১৮ ❖ সমান্তরাল - আব্দুর রাজ্জাক - পৃঃ ১৯ ❖ বাংলাদেশের বন্যা - ফাউজিয়া খাতুন - পৃঃ ১৯ ❖ প্রথম দেখা - আল সাহরিয়ার ইসলাম - পৃঃ ২০ ❖ উষ্ণ যাপন - প্রলয় সাহা - পৃঃ ২০ ❖ বসন্ত ঋতুরাজ - সাকিরুল মণ্ডল - পৃঃ ২১ ❖ শৈশব স্মৃতি - মৃন্ময় প্রামাণিক - পৃঃ ২১ ❖ আমার কলেজ - তৌফিক মণ্ডল - পৃঃ ২২ ❖ বাসযাত্রী - ওয়াহিদা পারভিন - পৃঃ ২২ ❖ মনে কী আছে - দীপ্তি হালদার - পৃঃ ২৩ ❖ ঠিক আছে - সামিম আখতার মোল্লা - পৃঃ ২৪ ❖ পরিচয় - সাকাইল হোসেন সেখ - পৃঃ ২৫ ❖ রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা - উম্মে সালমা - পৃঃ ২৮

■ অণুগল্প —

শিষ্টাচার ও ছাত্রসমাজ - সায়ম শেখ - পৃঃ ৩০ ❖ ঈদ-উল-ফিতর - মিন্টু ঘোষ - পৃঃ ৩১ ❖ হিয়ার হোলি - ঝর্ণা খাতুন - পৃঃ ৩২ ❖ বন্ধু - রিমা ঘোষ - পৃঃ ৩৩

■ ছোটগল্প —

এক গ্লাস দুধের দাম - শবনম বানু - পৃঃ ৩৪ ❖ পনেরো পুরুষ - রহেলা খাতুন - পৃঃ ৩৬ ❖ **Destiny - Attitude Queen** - পৃঃ ৩৮

■ প্রবন্ধ —

গায়ত্রী সন্ধ্যা : উদ্বাস্তু জীবনের বিবর্তনের চালচিত্র - পুলকেশ মণ্ডল - পৃঃ ৪৫ ❖ লিঙ্গ সাম্য : তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক অধিকার - পিয়ালী দাঁ - পৃঃ ৪৯ ❖ বাংলার লোকনৃত্য - চন্দ্রাণী পাল - পৃঃ ৫২ ❖ কবিতা ও বাস্তবতা - ইনজামউল হক - পৃঃ ৫৪ ❖ স্বেচ্ছারক্তদানে সম্প্রীতি - প্রলয় কুমার সাহা - পৃঃ ৫৮ ❖ জাতীয় সেবা প্রকল্প (NSS) আমার অভিজ্ঞতা - মতিউর রহমান - পৃঃ ৬২ ❖ করোনা ভাইরাস - মিঠুন সেখ - পৃঃ ৬৫

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে যে সকল সৈনিক ও সাধারণ নাগরিক প্রয়াত হয়েছেন, হাজী এ.কে. খান কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠন
"হাজী এ.কে. খান কলেজ"

অধ্যক্ষের কলমে —

"খাঁচার ভিতর অচিনপাখি কেমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।"

— লালন ফকির

শহর কেন্দ্রীক নবজাগরণের পথিকৃৎ যেমন রামমোহন রায় ঠিক তেমনি গ্রাম বাংলার বুকে অহিংসার বাণী সম্প্রচার করে নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন লালন ফকির। লালন ফকির দুই বাংলার গ্রামের সম্পদ। মানুষের শরীর রূপ খাঁচায় প্রাণরূপ অচেনা পাখিটি কেমন করে প্রবেশ করে এবং চলে যায়; প্রাণ-পাখির মানব শরীরে আসা-যাওয়ার সেই রহস্যটি যদি জানা থাকত তাহলে সেই পাখির পায়ে শিকল পরিয়ে রাখতাম। কিন্তু সে বেড়ি কেমন বেড়ি-মনোবেড়ি। মানুষের শরীরটি যেমন নিতান্ত বহিরঙ্গ, খাঁচা, মানুষের জাতি- ধর্ম-এ সমস্তই তেমনি বহিরঙ্গ, একেবারে বাইরের জিনিস। অন্তরের মানবতার স্বরূপটিই অর্থাৎ প্রাণ পাখিটিই তো আসল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতির সর্বপ্রকার বহিরঙ্গ সম্পর্ক বর্জন করে মানুষের অন্তর্নিহিত যে গুণ অর্থাৎ যার নাম মনুষ্যত্ব সেটিই প্রকৃত প্রাণ শক্তি, মানুষের প্রকৃত ঠিকানা।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠক্রমের বিষয়গুলির আলাপ আলোচনা এবং বাইরের আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা, চর্চা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিবছর কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এবছর পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছেন ড. পুলকেশ মণ্ডল, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তিনি অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষাকর্মীদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করেছেন। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী কলেজ বিমুখ হয়ে পড়ায় সেই অর্থে লেখা বেশি পাওয়া যায়নি। আমরা চাই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আরো বেশি করে সংস্কৃতি চর্চা করুক, সাহিত্য চর্চার প্রতি যত্নশীল হোক এবং তার প্রতিফলন ঘটুক কলেজ পত্রিকাতেও। কারণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব মানব জীবনে সুদূর প্রসারী। বর্তমান বিশ্বে মানবতা যেখানে বিদ্ধস্ত হচ্ছে তার প্রতিরোধ করতে হবে বিশ্বের শিক্ষিত ও সচেতন মানুষকেই। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সুরে সুর মিলিয়ে তাই আমরাও বলতে পারি —

"চলে যাব - তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

শুধু বুদ্ধিবৃত্তি চিত্তার শক্তির মতো ভালো বিষয়গুলি দিয়ে একটি জাতি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস গভীর বিশ্বাস, অপরিমেয় উৎসাহ, কল্পনাপ্রিয় ভাবের মাধ্যমে জীবনের গভীরতম রহস্যের উদ্ঘাটন হয়। উপলব্ধির সেই স্তরে পৌঁছাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করে কলেজ পত্রিকা, এখানে তাদের সৃজনী বৃত্তি ও ভাবোচ্ছ্বাসের উন্মোচন ঘটে।

"পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

— জীবনানন্দ দাশ

এটি দিন শেষের চিত্র। প্রকৃতির সব রঙ নিভে গেলে ছায়া অন্ধকার নেমে আসে। এই ছায়া অন্ধকার সব সৃষ্টিশীলতার উৎস। ইংরেজিতে একেই বলে Twilight zone এক বাস্তবতা থেকে আরেক বাস্তবতার যাওয়ার যে অবস্থা তা অনেকটা পাণ্ডুলিপির মতো। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ নয় একটি গ্রন্থের পূর্বরূপ। পৃথিবীর সব রঙ নিভে যাওয়া মানে অন্ধকার নেমে আসা, সেই অন্ধকারে জোনাকির রঙ ঝিলমিল করে। আর সেই সময় জমে ওঠা গল্পের মধ্যে এক প্রতীকী পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়। এই মুহূর্তটিই এক সত্তা থেকে আরেক সত্তার উপনিত হওয়ার মধ্যস্তর। পরিশেষে গল্প জমবে বনলতা সেনের সঙ্গে কথকের, তারা পাঠ করবে অন্ধকারে নিঃশব্দে ভাষায় রচিত এক গল্প।

হাজী এ.কে. খান কলেজ পত্রিকা 'সীবনী' ২০২২ পূর্ণ মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। বিশ্বায়নের প্রকট আড়ম্বরে আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক আজ উৎকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের সব শিকড় উপড়ে ফেলে মুছে নিচ্ছি নিজেরাই নিজেদের অভিজ্ঞান। একসময় আমাদের শেখানো হয়েছিল আগে মাটির খবর জেনে তারপর আকাশের দিকে তাকাতে হবে। আত্মস্মৃতির খোলা দর্পনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার ও রেওয়াজ যেন নেই আর।

তবু এই সত্য অনস্বীকার্য, আমাদের সত্তার নির্যাস হলো আমরা কি ছিলাম, রাতের সমস্ত তারা নিশ্চয় প্রচ্ছন্ন থাকে দিনের আলোর গভীরে। ঐ জন্য কালাপাহাড়ি পর্যায়েও শেকড়ে জলের ঘ্রাণ খুঁজে নিতে হয়। কী জীবন চর্চায় কী মনন প্রক্রিয়ায়। না হলে মাটি ও আকাশের মধ্যে অন্তর বাড়তে থাকে ক্রমাগত। সামঞ্জস্য বোধই জীবন ও মননের সারোৎসার।

"শিখিবার কালে বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির
সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ
আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য
ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার
চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

— রবীন্দ্রনাথ

আসলে অসম্পূর্ণ শিক্ষা আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করে দেয়। সামগ্রিক শিক্ষার কথা মাথায় রেখেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। একজন মহান শিক্ষক জ্ঞান, অদম্য ইচ্ছা আর করুণনার দ্বারা নির্মিত হন। আমাদের জীবনে অনেক সময় কঠিন বাঁধা আসে, নিজেকে ধ্বংস করার জন্য নয় বরং ভিতরে লুকানো শক্তিকে অনুধাবন করতে। যারা মহান ব্যক্তি তারা সব সময় ভয়ানক বাধার

সম্মুখীন হয়েছেন সংকীর্ণ চিন্তার মানুষদের কাছ থেকে। আমাদের নতুন কলেজ, অনেক দায়-দায়িত্ব আমার কাঁধে, সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলব লক্ষ্যের দিকে, এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। কলেজের উন্নয়ন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। আমি চাইবো আগামী দিনে হাজী এ.কে.খান কলেজ, মুর্শিদাবাদ জেলার সেরা কলেজে উপনীত হবে। আমি জেগে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। এলাকার মানুষের যে আবেগ, উচ্ছ্বাস, হাজী সাহেবের স্বপ্ন সমস্তটাই আমি বাস্তবে রূপদান করবো। কলেজের পরিকাঠামোর পূর্ণগঠনের কাজ বেশ কিছু পরিকল্পনা আমি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি। সেগুলি —

- এলাকার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচলন এবং হস্ত শিল্পের উপর জোর দেওয়া।
- হাজী সাহেবের ইচ্ছা অনুযায়ী, এলাকার সংখ্যালঘু মেয়েদের বেশি করে কলেজমুখী করা।
- কলেজ প্রাঙ্গণে এলাকার মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবির গড়ে তোলা।
- সরকার প্রদত্ত সমস্তরকম স্কলারশিপ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার পাশাপাশি শরীর চর্চার উপর জোর দেওয়া।
- দূর-দূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসের পূর্নগঠন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের সুলভ মূল্যের খাদ্য ও পানীয় জলের জন্য ক্যান্টিন ব্যবস্থা।
- N.S.S. -এর মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- পরিবেশ সচেতনতার উপর জোর দেওয়ার জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে গড়ে তোলা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন উদ্যান।
- আমাদের এখান থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন চাকরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আপনারা সঙ্গে থাকলে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তবেই এত কিছু কাজ খুব সহজে করা সম্ভব। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে আমার এই কর্মযজ্ঞ চলবে। সব সময় আমার মনে হয় সব আয়োজনই তো হয়ে গেছে, কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি। কলেজের অসম্পূর্ণ আয়োজন সম্পূর্ণ হলে তবেই সম্পর্ক স্থাপন মজবুত হবে।

"আমারে ফুটিতে হলো বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধক্লান্তে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হলো সাহসিকা অক্ষরার মতো।

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পত্রিকায় নতুন প্রজন্মের লেখকেরা কলেজের অনুকূল পরিবেশে আরও সমৃদ্ধ হবে। কলেজের কারিগরি প্রকল্পকে পরমোৎসাহে সযত্নে বছরের পর বছর ধরে রূপায়িত করার সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকেন, সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং প্রশাসনিক স্তরের ব্যক্তিবর্গ সকলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। এছাড়া বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ড. পুলকেশ মণ্ডলকে, যিনি গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনার কাজটি সম্পন্ন করেছেন। হাজী এ.কে. খান কলেজ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম মুখপাত্র এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি সম্পর্কে মূল্যবান প্রতিক্রিয়াগুলি পত্রিকার আগামী সমৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সাগ্রহে প্রতীক্ষায় রইলাম। পত্রিকার সফলতা কামনা করি।

তারিখ : ২০/০৮/২০২২

ড. গৌতম কুমার ঘোষ
অধ্যক্ষ
হাজী এ.কে. খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকের কিছু কথা —

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হাজী এ.কে. খান কলেজ পত্রিকা 'সীবনী' আত্মপ্রকাশের আলো দেখতে চলেছে। পড়াশোনা মানে শুধুমাত্র সিলেবাস কেন্দ্রিক পঠন-পাঠন ও পরীক্ষায় পাশ করা নয়। পড়াশোনা মানে প্রকৃতি সমাজ ও জীবনের পাঠ। যে পড়াশোনার সঙ্গে প্রকৃতি, সমাজ ও জীবনের পাঠ নেই সে পড়াশোনা শুকনো খসখসে, মার্কসিটের এক টুকরো কাগজে সীমাবদ্ধ।

"ঘন ঘন আনাগোনা   কতদিন দেখাশোনা,
তবু কেন মনে নাহি থাকে?
ব্যক্তি ডুবে যায় দলে   মালিকা পরিলে গলে
প্রতিকূলে কেবা মনে রাখে?
এ জীবন ভেঙে গড়ে   শ্যামল সরস করে
ছাত্রধারা বয়ে চলে যায়।"

— কালিদাস রায়

কবি কালিদাস রায় যথার্থই বলেছেন। জীবনের অনেক উত্থান-পতন ও ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজ এগিয়ে চলে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। বোতাম টিপলে কাঙ্ক্ষিত তথ্য ভাণ্ডার। রাশি রাশি তথ্য যা নিয়ে আমরা আহ্লাদিত। কিন্তু আমরা জানি জীবনের সঙ্গে মননের সঙ্গে সম্পৃক্ত না তুলে তথ্য সত্য হয়ে ওঠে না। রাশি রাশি তথ্য থেকে জীবন সত্যের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের মহার্ঘ্য উপলব্ধি পেতে আমাদের চর্চা করতে হয় সংগীত, নাটক, চিত্র ও সাহিত্য। সাহিত্যে শিক্ষা কী ধরনের হতে পারে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পথের সঞ্চয়' প্রবন্ধে বলেছেন —

"যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানাভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোন একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোন ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহা জাতীয় বলিতে পারি না — তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।"

শিক্ষা ও সংস্কৃতি শুধুমাত্র মনের একটা বিলাস নয় বা মনের সৃষ্টি সম্পদও নয়। এটি বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবন সংগ্রামে বিশেষ শক্তি জোগায়। বৃহত্তর দিক দিয়ে জীবন যাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। স্থবিরতা নয়, বহমানতাই হল জীবনের লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেই শক্তি লুকিয়ে থাকে। প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের জোরেই সেই অন্তর্শায়ী শক্তির প্রকাশ ঘটে। আমাদের মাথার উপরে আকাশে সূর্যের আলো থাকুক বা না থাকুক দণ্ড প্রস্তাব ছায়া আছে চিরদিন। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে শঙ্কিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই। আর আমাদের প্রতিদিকে মহাপুরুষদের বাণী কোলাহল করে। ঘুরে ফিরে আমরা যেমন করেই চলিনা কেন শেষকালে আমাদের অলক্ষ্য সত্যে উপনীত হতে হয় যে - শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা বিধান হয়, কোন প্রণালীর

দ্বারা নয়।

"বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তি স্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্পদ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তাহলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথই পথের সন্ধান দেয়। একপথ যেখানে শেষ হয়, সেখানেই দেখা মেলে আর এক পথের। এমনি করেই পথ থেকে এগিয়ে যাওয়া যায়। 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলার দীপ জ্বালাবার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।' আমরা জানি সাহিত্য যেমন সমাজ জীবনের দর্পণ, তেমনি যে অঞ্চলে সাহিত্য স্রষ্টার উপর বর্তায়, স্রষ্টা সে প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। তবে হুবুহু প্রকৃতির বিবরণে না গিয়ে তাকে বক্তব্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা দান করে বক্তব্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। ইতিহাস চেতনা, সমাজ-অভিজ্ঞতা ও কালজ্ঞান -এই বোধ যখন কোনো ব্যক্তি মানস সংবেদনার স্তর থেকে চেতনাপ্রবাহের নিগূঢ় আবেগ ও বিশ্বাসের ঐক্য বিন্দুতে সুগঠিত করতে সমর্থ হয়, সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা হিসাবে তখনই তার সিদ্ধি। 'সীবনী' পত্রিকার লেখাগুলোর মধ্যেও সেই বিষয়ের ব্যতিক্রম হয়নি।

বিশ্বায়নের আড়ম্বরে আমরা যেমন আধুনিক থেকে আধুনিকতর হতে চলেছি, ঠিক অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় ভেদাভেদ অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সব মিলিয়ে গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো চাকা' কবিতার সেই বিখ্যাত পঙক্তি মনে পড়ে যায়—

"একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে পুনরায় ডুবে গেলো এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হল ফল।"

বর্তমান সংবাদপত্র, টেলিভিশন -এর খবরে চোখ রাখলেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে কিছু কিছু মানুষের নির্দয়, নির্মমতার চিত্র। ওই ঈর্ষাপরায়ণ এবং হিংসা পরায়ণ মানুষগুলোই সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় ভেদাভেদ ও অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। একমাত্র যুব সমাজকেই এগিয়ে এসে সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মানবতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে এই সমস্ত কুচক্রী মানুষগুলোর মুখোস খুলে দিক, না হলে সমাজ আরও কলুসিত হবে। পত্রিকার পক্ষ থেকে সেই সৃজনশীল চেতনাকে শতকোটি প্রণাম জানাই। এর সঙ্গে আগাম শুভেচ্ছা জানাই সেই সকল রসজ্ঞ পাঠক সমাজকে যারা পত্রিকাটি পাঠ করে অনেকের সঙ্গে নিজেকেও সমৃদ্ধ করে নেবেন। এই বিকাশশীল মানুষের পরিশ্রমে পৃথিবী প্রতিনিয়ত নানাভাবে ফলবতী হচ্ছে।

এই মুহূর্তে আমাদের কলেজে বিভিন্ন বিভাগের তৎপরতায় বিভাগীয় সেমিনার যেমন হচ্ছে তেমনি ইংরেজি বিভাগ একটি জাতীয় স্তরের আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্পন্ন করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত চলছে।

অবশেষে সীবনী প্রকাশিত হতে চলেছে। লেখার শিল্প নৈপুন্যতার বিচারের দায়িত্ব আপনাদের। পত্রিকা প্রকাশে, বিকাশে, রয়নে অলংকরণে কিছু ভুল যদি থাকে তা সম্পূর্ণ-রূপে আমার। পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় প্রেরণা-প্রদানের জন্য তাকে অকুণ্ঠ চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা দান ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার কারণে লেখা খুব বেশি পাওয়া যায়নি। তবে যে লেখাগুলি এসেছে সেগুলি কাঁচা হাতের লেখা হলেও বেশ গুণ সম্পন্ন। লেখা সংগ্রহ এর ব্যাপারে সুকুমার দা অগ্রণি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের।

এই সময় পর্বে অনেক নক্ষত্র পতন ঘটেছে সাহিত্য ও সংগীত জগতে, তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। পত্রিকার ঐ সংখ্যা যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে এবং যাঁদের লেখা বিভিন্ন কারণে পাঠকদের সামনে আনতে পারলাম না, তাদের সকলকেই সম শ্রদ্ধা জানাই। মহাকালের অনন্ত যাত্রাপথে হাজী এ.কে. খান কলেজ পত্রিকা 'সীবনী' এগিয়ে চলবে। আশা করি আগামীদিনে পত্রিকাটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

বিনীত —
পুলকেশ মণ্ডল
(পত্রিকা সম্পাদক)

—ঃ কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী ঃ—

অধ্যক্ষ	ঃ	ড. গৌতম কুমার ঘোষ	এম.এ., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	ঃ	ড. পুলকেশ মণ্ডল	এম.এ., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
		ড. নলীগোপাল মালো	এম.এ., পি.এইচ.ডি.
		ইনজামাম উল হক	এম.এ., বি.এড.
		আব্দুর রাজ্জাক	এম.এ., বি.এড.
ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	ঃ	সামিম আকতার মোল্লা	এম.এ., এম.ফিল.
		বিদিশা মুন্সী	এম.এ.
		বাহাদুর বিশ্বাস	এম.এ.
দর্শন বিভাগ	ঃ	ড. মুনমুন দত্ত	এম.এ., এম.ফিল., বি.এড., পি.এইচ.ডি.
		ইমানুয়েল হাঁসদা	এম.এ., এম.ফিল.,
		মঃ সেলিম হক	এম.এ.
		আসমিন সেখ	এম.এ., বি.এড.
ইতিহাস বিভাগ	ঃ	ড. পিয়ালী দাঁ	এম.এ., পি.এইচ.ডি.
		ড. চন্দ্রানী পাল	এম.এ., পি.এইচ.ডি.
		কিশোর সরকার	এম.এ., বি.এড.
		অনিকেত সরকার	এম.এ., বি.এড.
		বাদশা খাঁন	এম.এ., বি.এড.
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ	ঃ	ড. কৃষ্ণেন্দু মুন্সী	এম.এ. (এডুকেশন), ইংরেজি, বি.এড., পি.এইচ.ডি.
		ডঃ অরুণ কুমার সিংহ	এম.এ., বি.এড., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি.
		ফারুক সেখ	এম.এ., বি.এড.
		মোঃ ইসমাইল হক	এম.এ., বি.এড.
		মিঠুন সেখ	এম.এ., বি.এড.
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	ঃ	সাফাইল হোসেন শেখ	এম.এ., বি.এড.

ভূগোল বিভাগ	ঃ	প্রত্যুষ কুমার ঘোষ	এম.এস.সি.
		পরিমল কর্মকার	এম.এস.সি.
		বুবাই ঘোষ	এম.এস.সি.
শারীরশিক্ষা বিভাগ	ঃ	সঞ্জিত কুমার রায়	এম.এ., এম.পি.এড.
পরিবেশবিদ্যা বিভাগ	ঃ	মহামায়া ঘোষ	এম.এ., বি.এড.
সমরবিদ্যা বিভাগ	ঃ		
গণিত বিভাগ	ঃ		
সংস্কৃত বিভাগ	ঃ	দেবদ্যুতি চক্রবর্তী	এম.এ., বি.এড.
আরবি ভাষা ও	ঃ	মোঃ রেজাউল করিম খান	এম.এ.
সাহিত্য বিভাগ		মোঃ নবাবজানি	এম.এ., বি.এড.
অফিস বিভাগ	ঃ	অতীন ঘোষ	বি.এ., হিসাব রক্ষক
		প্রলয় কুমার সাহা	এম.কম., কোষাধ্যক্ষ
		জামিলা খাতুন	বি.এ., করণিক
		আলাউদ্দিন বিশ্বাস	টাইপিস্ট
		হাসানুল ইসলাম	এম.এ., পিওন
		সুকুমার বিশ্বাস	পিওন
		আমিনুর জামান	এম.পি., দ্বাররক্ষী
		রঞ্জিত কুমার দাশ	এম.পি., অংশকালীন ঝাড়ুদার
প্রযুক্তিক	ঃ	কিসমত শেখ	অস্থায়ী কর্মী
		মেহবুব মুর্শিদ খান	অস্থায়ী কর্মী

এ পর্যন্ত আমরা কলেজের পূর্ণ সময়ের অধ্যক্ষরূপে পেয়েছি —

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১	ড. গৌতম কুমার ঘোষ	০৭/০৭/২০২১

সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি — পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।

সভ্যতার সংকট —

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা

আমি শিশু

সাবনাজ পারভিন
বাংলা বিভাগ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

আমি শিশু দেখিনিতো
কি হয়েছে ভবে,
জানব আমি সেদিন তবে
ইতিহাসে রবে।

আমি শিশু মায়ের কোলে
অজানা এই ভবে,
কখন কি যে মহামারী
কখন কি যে হবে।

আস্তে আস্তে বড়ো হবো
দেখবো আলো পৃথ্বী,
নিমেষেই যে হয়না বড়ো
শরীরের নাই বৃদ্ধি।

বাবা মাকে বলতে শুনি
ধরেছিল রোগে,
এমনি এক রোগ যে ছিল
বিশ্বজাহান ভোগে।

ছিন্নভিন্ন পৃথিবীটা আজ
ভরে গেল শবে,
এ আকাশ, বাতাস অগ্নিদগ্ধ
কিছু নাহি রবে।

মুহূর্তে পৃথিবী বহ্নির শিখা
কেহ নাহি পাবে ত্রাণ,
ভাবা খাপার তালে ছন্দহীন
উত্তাল সমুদ্র ভেকেছে যখন বান।

ছন্দহীন নৃত্যের তালে
মৃত্তিকা করিছে নৃত্য,
কেহ আজ বাঁচিবে না
হোক না সে ধনী কিংবা মধ্যবিত্ত।

আপনার তালে নেচে যায় ভুবন ধরা
ভেসে ওঠে তাঁর চিত্ত,
শূন্যতা খুঁজে ফেরে অভিকর্ষজ
মহাকর্ষজ দেখায় তার আদিত্ব।

পাহাড় ভ্রমণের কথা

সাকিল মণ্ডল

ছেড়ে যেতে বড়োই কষ্ট হবে
তোমার ওই প্রকৃতির মায়া।
কুয়াশার মাঝে লুকিয়ে রাখা
তোমার সেই অপরূপ সৌন্দর্যতা।
সূর্য কে হার মানানো
তোমার ঐ বৃথা চেষ্টা।
হেরে গিয়েও তোমার সেই নিজেকে
তুলে ধরার অসাধারণ ক্ষমতা।
তারপরে ভোরের আলোয় ঝলমলিয়ে
ফুটে ওঠা তোমার সেই ঘুমন্ত চেহারা।
ভুলবোনা তোমার সেই ভোরের সৌন্দর্যতা।

রাত্রি নামার সাথে সাথে
ভেঙে দেওয়া কিছু মিথ্যা ভাবনা।
তারারা যে শুধু আকাশেই থাকেনা
বুঝিয়ে দিলে তুমি অন্ধকার নামার সাথে সাথে।
তবে এ তারা নিভতে থাকে এক এক করে
রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে।
ভুলবোনা তোমার সেই রাত্রির নিস্তব্ধতা।
ভুলবোনা
তোমার গায়ে ধাক্কা খেয়ে
মেঘেদের বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়া।
ভুলবোনা
তোমার ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম
মেঘেদের স্পর্শ করা।
ভুলবোনা
তোমার গা বেয়ে উপরের
আকাশের দিকে উঠে যাওয়া।

মনের ইচ্ছে

ঝর্ণা খাতুন

এডুকেশন অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

ইচ্ছে করে পাখি হয়ে
নীল আকাশে উড়ি।
ইচ্ছে করে সবুজ ঘাসে
শিশির হয়ে ঝরি।
ইচ্ছে করে বৃষ্টি হয়ে
আকাশ থেকে পড়ি।
ইচ্ছে করে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে
জগৎ আলো করি।
ইচ্ছে করে জাহাজ হয়ে
নীল সাগরে ভাসি।
ইচ্ছে করে সারা জীবন
শিশুর মতো হাসি।
সবাই সবার ইচ্ছেগুলো
নিজের করে দ্যাখো
আমার ইচ্ছে আমার
কাছে বন্দী হয়ে থেকো।

কবিতা

ভাবনা ও কবি

পরিমল কর্মকার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (ভূগোল বিভাগ)

শব্দের কারাগারে আবদ্ধ রাখতে
করি চেষ্টা স্বাধীন ভাবনাকে।
ভাবনারা সব হাসে-দেখে আমাকে।
আমার চেষ্টা কি তবে বৃথা?
কেন লিখছি তবে আমি-পাতার পর পাতা?
ভাবনারা আবার হাসে, ব্যাঙ্গাত্মক হাসি।
মাঝে মাঝে রেগে বলি, 'এবার দেবো তোদের ফাঁসি'।
তারা বলে, 'আমরা স্বাধীন, মুক্ত, বাধাহীন'।
তুমি পারবেনা করতে আমাদের পরাধীন।
আমি বললাম —
'তোমরা বিমূর্ত, পাবো না স্পর্শ, পাবেনা কোনো ভাষা'।
সর্বদা বহমান তোমরা থাকো সবার অগোচরে;
আমার শব্দই দেবে তোমাদের মূর্ত রূপ সম্মুখে সবারে।
রিক্ত কাগজে - কলমের গভীরে, বেড়াও তোমরা সুরে।
আমিই তুলে ধরি - তোমাদের পরিচয় বিশ্বদরবারে।
আমি মানি, তোমরা স্বাধীন।
হরণ করিনি তোমাদের স্বাধীনতা।
লেখনীতে আমার তোমরাই তো সাথ দাও,
লিখতে যে আমাকে হবেই, তোমরা চাও বা না চাও।
জানি, তোমরা থেকে যাবে অমর হয়ে;
আর আমি চাপা পড়ে যাব কাগজের কবরে।
তবে, কোনো না কোনোদিন -
আমার কবর পড়বেই কারো নজরে;
সেদিন আর আমি থাকবো না অগোচরে।
ওইদিন আমি নেবো শ্বাস প্রাণ ভরে।

আমার অবর্তমানে কাগজের সমাধিই তুলে ধরবে অস্তিত্ব।
সেদিন বুঝবে সবাই আমি মৃত নই; আমি জীবিত।
ভাবনারা আবার হেসে বলে -
'আমরা অমর, আমরা স্বাধীন।'
বললাম আমি, 'তোমরা মুক্ত, তোমরা অমর।
তবে তোমাদের পরিচয় কী?
তারা চুপ করে রয়।
বললাম, 'ঘাবড়ে যেও না।'
ওই কাগজের ভিড়ে, শব্দের কারাগারে -
যে রূপ বন্দী করে রেখেছি;
যারা দেখবে, তারা বুঝবে —
আমি তোমাদেরই কথা ভেবেছি।
আমি মরে যাব;
থাকবে তোমরা সভ্যতার শেষ পর্যন্ত।
ডুবে যাব আমি, তোমাদের হবেনা কখনো অস্ত।
তোমরা বাধাহীন, তোমরা সত্য, থাকবে চিরদিন মুক্ত।
তোমাদের পরিচয় দেবে, আমারই লেখা শব্দ।

কবিতা

শিক্ষকের মর্যাদা

দেবজিৎ মণ্ডল
ভূগোল অনার্স (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

শিক্ষক মানে মনের মধ্যে শিক্ষা আছে যার,
শিক্ষক মানে কর্তব্য আর ক্ষমার সমাহার।

শিক্ষক মানে যিনি হলেন শিক্ষাদাতা,
শিক্ষক মানে পিতা-মাতা ছাড়া দ্বিতীয় পিতা-মাতা।

শিক্ষক মানে মনে আসে এমন একটি লোক,
যিনি হবেন আমার বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক।

শিক্ষক মানে একটি জীবন আদর্শ রচিত,
শিক্ষক মানে সকল জাতির শক্ত মেরুদণ্ড।

শিক্ষক মানে আলোর দ্বারা মেটায় অন্ধকার,
তাই আমার সকল শিক্ষকদের জানাই প্রণাম এবং নমস্কার।

ভারত সন্তান দাবিদার

ওয়াহিদা পারভিন
ইতিহাস অনার্স (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

লজ্জা করে না তোমাদের তোমরা বলো
আমরা ভারত সন্তান।
লজ্জা করেনা তোমাদের?
ধর্ষণকারি সেই সন্তান।
রাতারাতি কেন নারী পাচার?
কেনই বা ড্রাগস, মদ এর নেশায়-
যুক্ত দেশের সাধারণ মানুষ?
লজ্জা করে না তোমাদের তোমরা
নাকি ভারত সন্তান!
কথা দিয়েছিলে দিনের বেলায়
আমরা আনিব নারী পুরুষ সাম্য অধিকার।
তবে রাত্রে কেন এত অবিচার?
তোমরা দাবি করো "ভারত সন্তান"!
আসলে তোমরা নর রাক্ষস,
মিথ্যা যত দাবিদার।

কবিতা

সমান্তরাল

আব্দুর রাজ্জাক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (বাংলা বিভাগ)

চৌকাঠ পেরিয়ে আসে অবাধ্য উষ্ণতা;
নীল থেকে নীলাভ হয়ে আসে,
অন্ধকারের হাতছানি।
আঙুলের ফাঁকে লেগে থাকে
শহুরে অবসাদ।
শুনেছি স্বপ্ন বুনতে নাকি, কিনতে হয় অনেকটা সময়।

এখানে চাঁদের আলোতে মেশে -
জলের আঁকিবুঁকি।
তাই জ্যোৎস্না মেখে ধূসর হয় - রাতের রূপকথারা।

এখনো কিছু ক্যানভাসে অলীক সুখেরা খেলা করে।
কারণ শুধু বৃত্ত নয়,
কিছু গল্প আজও সমান্তরাল হতে জানে।

বাংলাদেশের বন্যা

কাওজিয়া খাতুন
..... (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা বন্যায় ভেসে যায়
সেই জায়গাকার মানুষ আজকে বড়োই অসহায়।

দেশের খবরে আঁতকে উঠি ঘর বাড়ি যায় ভেসে
বাচ্চা কোথায় তলিয়ে গেল? পাই না বাবা খুঁজে।

বুক ফাটা মায়ের আর্তনাদে কান্নায় ভরে চোখ
পন্যের দাম করেছে বৃদ্ধি কিছু অমানবিক লোক।

সুস্থ দিনে নৌকা ভাড়া পাঁচশো ছিল যার
বন্যায় ভেসে সেই ভাড়া আজ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার।

চারিদিকে ডুবছে মানুষ ডুবছে বাড়ি ঘর
এসব চিত্র দেখেও চোখে মানুষ স্বার্থপর।

স্বার্থপরের মত বাঁচে কিছু মানুষজন
এই করুণ চিত্র দেখেও তাদের ভেজে না মন।

প্রথম দেখা

আল সাহরিয়ার ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

যখন তোমায় প্রথম দেখেছিলাম,
মনে বয়েছিল বসন্তের হাওয়া -
হৃদয় চেয়েছিল অনেক করে
তোমায় আরো কাছে পাওয়া।

তোমাকে ডেকেছি, বাঁকেতে বেঁকেছি
বেঁধেছি অনেক সুর —
স্বপন বেশে নিজের দেশে
চলে গেছ বহুদূর।

জীবন সিঁড়িতে উঠছি গো রোজ
একটু একটু করে,
আমি আজ শুধু রয়েছি একা
তুমি আছো বহুদূরে।

প্রথম যেদিন চোখে চোখে হল
জেগেছিল মনে আশা;
আজকে তবে কেন ব্যবধান
নিঠুর সর্বনাশা।

অপেক্ষমান নিথর এ মন,
বসে বসে দিন গোনে -
হয়তো তুমি আসবে ছুটে
মম হৃদয়-রোদন শুনে।

বসন্ত রায় মরু ঝড় সম
কখনো না যেন বয় -
আমিও হয়তো বুঝবো গো সখী,
ভালোবাসা কারে কয়।।

উষ্ণ যাপন

প্রলয় সাহা
কোষাধ্যক্ষ (হাজী এ.কে. খান কলেজ)

বিশ্ব জুড়ে হাওয়া বদল
হচ্ছে দিনে দিনে।।
মানুষ জানে হচ্ছে কেন
এর ভেতরের মানে।।
জেনে বুঝে চুপ রয়েছে
শ্রেষ্ঠতম প্রাণী।
নিজের ভাল চাইনা আজও
সবাই আমরা জ্ঞানি।।
নগর শহর বাড়ছে দ্রুত
ধ্বংস হচ্ছে প্রকৃতি।
তবুও আমরা অবুঝ হয়ে
ধ্বংস করি পৃথিবী।
দিনে দিনে বাড়ছে গরম
উষ্ণায়নের ফলে
তারা কেন বোঝেনা আজও
উষ্ণায়নের মানে।।

বসন্ত ঋতুরাজ

সাকিরুল মণ্ডল
বি.এ. অনার্স (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

শীতের অবসানে বসন্তের আগমনে,
মোর স্মৃতি মনে পড়িলো হে বসন্ত ঋতুরাজ।
ফাল্গুন-চৈত্র মোর স্বপ্নের সুঘ্রাণ,
এই দুই মাস মোর স্মৃতির বসন্ত ঋতুরাজ।
তোমার জন্মভূমিতে বসন্তরানির পোশাক,
ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।
শিমুলে-পলাশে আগুন লাগিলো দুলে দুলে,
মল্লিকা-মালতীর স্নিগ্ধ গন্ধ বাতাসে...
ছড়িয়ে যাবে হে বসন্ত ঋতুরাজ।
শোনা যায় মধুপের গুঞ্জন, কোকিলের ডাক,
কত যে স্বপ্নের ঋতু মোর বসন্তের ঋতুরাজ।
বসন্তের গন্ধ আমার যৌবনের বার্তা বয়ে আনে,
কোকিল ও আমার প্রিয় বসন্ত ঋতুরাজ।

শৈশব স্মৃতি

মৃন্ময় প্রামাণিক
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ (চতুর্থ সেমিস্টার)

এক মুঠো রোদ্দুর, এক ফালি চাঁদ।
একটা একাকী পাহাড়
স্রোতহীন নদী,
দিগন্তরেখা পেরিয়ে যাওয়া একলা আকাশ।
মিষ্টি খেজুর রসের একটা সকাল,
পলাশ ঝরার বিকেল,
একাকী পথ চলা এক সমুদ্র
উতাল পাথাল ঢেউয়ে বয়ে চলে
এক অজানার সন্ধানে।
হারিয়ে ফেলা শৈশব, কৈশোর নিজেকে নিয়ে ভাবা।
যৌবনের জন্মলগ্নে হারিয়ে ফেলা একটা তুমি।
কিছু সমাপ্তি না হওয়া .....
উপসংহার না পাওয়া কিছু উপন্যাস।

আমার কলেজ

তৌফিক হক মণ্ডল
..... (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

আমার কলেজের আঙিনা ভরা
হাজার ফুলের গাছ,
আমার কলেজের শিক্ষক সেরা
মানুষ গড়ার ছাঁচ।

আমার কলেজের লাইব্রেরিটা
হাজার হাজার বই,
আমার কলেজের বন্ধু-বান্ধব
পড়াশোনা হইচই।

আমার কলেজের ক্যান্টিনখানা
ঘুগনি, মুড়ি, ছোলা,
আমার কলেজের শিক্ষকের সাথে
মন খুলে কথা বলো।

আমার কলেজ এগিয়ে অনেক
বিচার করলে মান,
আমার কলেজ হাজি এ.কে. খান
কাদের খানের দান।

বাসযাত্রী

ওয়াহিদা পারভিন
ইতিহাস অনার্স (দ্বিতীয় সেমিস্টার)

রাস্তায় চলে যত সোজা সোজা গাড়ি যে -
তার মাঝে এই, বাস আর লরিযে।
যাত্রীরা যখনি
টাইম টেবিল ধরে বাসে ওঠে তখনি
ঠেলা ঠেলি গুঁতোগুতি নিয়ে পড়ে হুমড়ে -
এক এক জন দেয় হাত পা দুমড়ে।
ঘামের গন্ধে সব -
চ্যাটচেটে শরীরে,
যাত্রীর চিৎকার ওরে বাবা-মারে।
তারপর হঠাৎ যদি ব্রেক মারে ড্রাইভার,
যাত্রীর ধাক্কায় চলে যায় পিছনে।
মাঝে মাঝে রাস্তায় যাত্রীরা উঠছে,
বাসের ভিতরে তাই ধাক্কাটা বাড়ছে।
এত ভিড়ে বাস কন্ডাক্টর টাকা -
চায় যখনই
যাত্রীর ইচ্ছা টাকা নয় ঘুষি দিই তখনি
যখন যাত্রীরা করে বাস ফাঁকা
যাত্রী ছাড়া বাস, তুমি বড়ো একা।

কবিতা

মনে কী আছে

দীপ্তি হালদার
..... (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

মনে কী আছে তোমার?

সেই দিগন্তের মিলনে প্রান্তরে ধারে বসে থাকা দুজনের।
চিরহরিৎ সন্ধ্যায় বসে থাকা, পাশে দিগন্তের বাতাস ছুটে ছুটে আসা।
তোমার কী মনে আছে?

স্বপ্নগুলো কেমন রঙিন হয়েছিল তোমার আমার মিলনে
নদী সেদিন ভীষণ ভাবে বর্জিত হয়েছিল আমাদের ভাঙনে।
তোমার কী মনে আছে?

বলেছিলে না ভাঙনের পথে হেঁটে, থাকব আর কতদিন দুজনে
আমি বলেছিলাম ধৈর্য্য ধর সময়ই শেষ কথা বলবে।
তোমার কী মনে আছে?

আচ্ছা,
সেই যে নির্জনতার রাস্তায় আমরা হেঁটেছিলাম একসাথে
কত গল্প, কত কথা, কত হাসিই না বেঁধে রেখেছিল আমাদেরকে মনের অন্তর
তোমার কী মনে পড়ে?

স্বপ্ন যখন নতুন আকাশ ছুতে চাওয়া, রঙিন মেঘের ভেলাই ভাসা,
তখন মাটিতে পড়ে থাকা অনন্দের মুহূর্তগুলিকে কী বেঁধে রাখা বৃথা?

সময়ের সাথে চলতে চলতে তুমি এগিয়ে গিয়ে হারিয়েছ এতটাই
পেছনে ফিরে তাকিয়েও বুঝতে পারনি দূরত্ব বেড়েছে নাজানি কতটাই।

প্রার্থনায় তুমি হও রঙিন ভাল থেকো সারাটা জীবন সুখে
হয়ত যদি আমিও থাকতাম পাশে ভেসে যেতে তুমি নতুন
আলোর উচ্ছ্বাসে।

কবিতা

ঠিক আছে?

সামিম আকতার মোল্লা
সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি বিভাগ)

ঠিক আছে,
তাহলে আসি এখন।
ঠিক নেই!
কোন কিছুই ঠিক নেই!
তবু "ঠিক আছে" বলতে হয় শেষে,
ঠিক যেমন "যাই" বলতে নেই,
বলতে হয় "আসি।"

ভালো কথা নর্দমায় ভাসে;
আর মন্দ কথা —
গগনচুম্বী মিনারের মাথায় পত-পত পতাকা!
গঠনশীল লোকগুলো
শুকনো পাতার মতো, ফেলনা;
আর বিনির্মাণকারীরা গঠনতন্ত্রের কর্ণধার!
ওরা যারা কাজ করতে জানে,
কাজ করতে পারে, করাতে চায়,
প্রতিদিন নিয়মিত কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরে
ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে।
তবু নির্লজ্জের মতো
আরো একবার আশা করে
পরদিন কাঁচা সূর্যের আলোয়;
আর পড়ন্ত বিকেলে
আরো একবার স্তিমিত হয়
কিছু করার উদ্যম।
যারা চেয়েছিল গোলাপের সুবাসে
সুরভিত করতে সুনিবিড় সংসার,
রাজ-নির্দেশে তারা কেমন খোজা হয়ে গেল;
আর সংসারের ফুলদানি ভরাট হল
কৃত্রিম গোলাপে!
হ্যাঁ, তাতে গন্ধ না থাকুক,
রঙ তো আছে —
সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো
চোখ ধাঁধানো রঙ!
তুমি-আমি শুধু বৃথা তর্কে মাতি:
"ঠিক কে বা কারা স্বাধীনতার সৈনিক?"
ওদিকে হনুমানে সাবাড় করল
পাকা-কাঁচা ফল, এমনকি কচি পাতাও!
তবু তোমার-আমার আজ্ঞা চলে,
তর্ক-বিতর্ক চলে, অজস্র কথোপকথন:
সত্ত্বার সংঘাতের সংক্রমণ,
আর মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস-বিরতি।
দাদা, লাভ নেই।
তুমি আমি থামি কিছুক্ষণ;
পৃথিবীটা আরো একবার ঘরে আসুক।

আচ্ছা।
বেশ।
ঠিক আছে।
তাহলে আসি এখন!

কবিতা

পরিচয়

সাফাইল হোসেন সেখ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

জান কি কেউ আমার পরিচয়?

আমি — এক হতভাগা, মূর্খ আমি ভণ্ডধারী
এ জগৎ মাঝে এসেছি শুধু তোমাদের তরে
জ্বালাতন দিতে,
তাইতো তোমরা চিনলেনা মোরে, জানলেনা মোর পরিচয়।

আমি — প্রভাকর-নিশাকর
দিনের বেলায় রৌদ্র নিয়ে রাত্রে আসি জ্যোৎস্না হয়ে,

আমি — গগন বারিধি ভেদিয়া
খুঁজে চলি শুধু স্বর্গ-নরক হেথা

আমি — শশধর, বিষধর কালনাগিনী ফণী

আমি — হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন-বৌদ্ধ

আমি — মানিনা কোন ধর্মের কর্ম, মানিনা তোর আইন

আমি — রামধনুর সাত রঙে রাঙিয়ে তুলি অম্বর

আমি — কালবৈশাখী বন্যার সলিল
কখনো ভাষায়ে চলি ঘর-বাড়ী

আমি — দে ফুজ এমিল জোলা, কিংবস্তির নায়ক আর্থার
ক্যালিপসো সুর সম্রাট আমি।

আমি — অনল-শান্ত আমি
তুরঙ্গমের লাগাম ধরে ছুটে চলি উন্মাদ হয়ে

আমি — চঞ্চল-চির চঞ্চল সর্বাহারা পথের পথিক

আমি — ভয়ানক ভীম -
অলি হয়ে চাঁক বেঁধেছি নতুন শাখী ডালে

আমি — রত্নাকর ভয়ানক সেই মীর

আমি — ভবিষ্যতের আশা স্বপ্নে করেছি দেশ স্বাধীন

আমি — গঙ্গা-যমুনা-পদ্মা

আমি — রণক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র, লঙ্কা করি লণ্ডভণ্ড

আমি — মৃত্যুকে করিনা ভয় - লড়ে চলি সবার সাথে
প্রতিবাদে ভরা আঁখিপাতে
সবাই আমায় শত্রুভাবে, আমি যে কলঙ্ক তাদের

আমি — সহজ মার্গের পথিক
নগরে নগরে ঘুরে ভিক্ষে করে চলি

আমি — সৎ পিতৃদেবের আত্মজ
আমায় রুদ্ধ করতে পারেনি, তোমাদের আঙিনায় পৌঁছে গেছি

আমি — বর্ষা-শীত আমি
কোকিল সেজে কুহু ডাকি বসন্তকাল এলেই

আমি — দৈত্য-দানব রাক্ষসী

আমি — জমিদারি পেয়াদা
শাসন করে চলেছি যত কর আদায়ের বোঝা

আমি — মিরজাফর করেছি বেইমানি নবাবের সাথে

আমি — কিন্নর (স্বর্গীয় গায়ক)

আমি — স্বনাম খ্যাত রাজা ইন্দ্রসেন

আমি — কালা-পাহাড়, বিষধর ফণী লয়ে বসে থাকি তেপান্তরে

আমি — আতঙ্কবাদ, সর্বহারা আমি

আমি — বঞ্চিত হয়েছি আজি বন্ধুদের কাছে থেকে
তবুও বড়ো ভালবাসি বন্ধুদের দেখে

আমি — দুঃখীত-বাথিত-কল্লোলিত নদী

আমি — সুদখোর মানব দরদি

আমি — ভীমসেন্ট ভ্যানগগ, পাথর ইটের তৈরি মিশরের পিরামিড

আমি — রেড-ইণ্ডিয়ান, কার্নিভালে মজা

আমি — ত্রিদিব উড়ন্ত চাকি, মুখোশ পরা মানব সন্তান

আমি — স্বাধীনতার ব্রত রয়েছি সংসারে
আসে যদি ইংরেজ করিব পরাজয় তারে

আমি — ঘুষের পেয়ালা, ঘুষ খেয়ে চলি সারাক্ষণ

আমি — ভাবনার সাগর, ভাবতে ভাবতে চলে যায় দিন অন্ধকারের মাঝে

আমি — সন্ধ্যা, প্রভাত আমি, কলেরাক্রান্ত রোগী

আমি — পারাবার নেশাকর, আমেরিকা, লণ্ডন, চীন, জাপানের সাথী

আমি — আমির শাহী ওপর
হিটলার আমি, কূটনীতি করে থাকি

আমি — পাহাড়, জঙ্গলের রাজা
অনলের ভ্রুত আমি বিষাদের ছায়া

আমি — চোরাই ব্যবসা ধরেছি দস্যু নেতা হয়ে

আমি — ফাঁকি বাজি ধোঁকা বাজি, ন্যাকামি কাজ করে থাকি

আমি — হুসেন শাহীর বংশধর
গুপ্ত যুগের অনাচার আমি পাল বংশের রাজা

আমি — মজুর ক্ষেত মজুর, অকাল দুর্ভিক্ষের ছায়া

আমি — বদমাইশ সকলের কাছে নোংরা আমি

আমি — স্বপ্ন অন্ধকারের সাক্ষী

আমি — ওসবের কিছুই নয়, মনের কলমে লিখে চলে যাই

আমি — এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য ছেলে ভাই –এই মোর পরিচয়।

কবিতা

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা

উম্মে সালামা
ষষ্ঠ সেমিষ্টার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

লাবণ্য অমিতের বিচ্ছেদ
তুমিও জানো নিশ্চয়
তাদের শেষযাত্রা হয়েছিল
মুক্তি পেতে
বেলা শেষে
ধর্ম নামের ঢেউয়ে
তোমার আমারও বিচ্ছেদ হবে
আচ্ছা
তাতে কী?
অভিযোগ না রেখে
অশেষ ভালোবাসা রাখা যায় না?
যেমন ধরো
আমাদের শেষ যাত্রা
এভাবে সাজাবে
তুমি আমার পছন্দের
নীল রঙের শাড়ি পড়ে আসবে
খোলা চুল হাতে একগুচ্ছ
আর হালকা ঝোড়ো বৃষ্টির সাথে
গঙ্গার ধারের
সেই স্মৃতি দিয়ে সাজানো
গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে
তুমি অপেক্ষা করবে
আমি ইচ্ছে করেই রোজকার মতো
দেরি করে আসবো
তোমারো রাগবার জন্য
তোমার অপছন্দের
কটকটে রঙের শার্ট
Ripped করা Jeany
আর অগোছালো চুল নিয়ে
তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো
তবে তোমার রাগ ভাঙানোর জন্য
সেদিনও একগুচ্ছ তোমার
পছন্দের কালো গোলাপ থাকবে হাতে
আর সময়টাও হবে
সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত
তবে সব কিছু এক থাকা সত্ত্বেও
সেদিন বদলে যাবে অনুভূতিগুলো
ফ্যাকাশে মুখ থাকবে
অসম্পূর্ণ প্রেমের ছাপ
বদলে যাবে আমাদের Conversation।
কারণ আমার এত কিছু করা সত্ত্বেও
সেদিন আর আমার রাগ হবে না
তাই অযথা আমিও বলবো না
Sorry রে পরদিন থেকে আর এমনটা হবে না।
সেদিন হবে
আমাদের শেষ যাত্রা
কথা শুরু হবে ঠিক এইভাবে
আচ্ছা পবিত্র
এই স্মৃতি বাঁধানো গাছটা কি
আজীবন আমাদের ভালোবাসার সাক্ষী দেবে।
তুমি বলে উঠবে,
চলো আজ অন্তিম যাত্রায় পথ চলা যাক
এরপর শুরু হবে
সেই গঙ্গার পাড়ে
অসমাপ্ত এক অসম্পূর্ণ প্রেমের লেশ চল
চলতে চলতে বলবে
উর্মি ভালোবাসি তোমায়

আজীবন ভালোবাসবো
ঠিক এতটা বা হয়তো এর থেকে বেশি
ধরো যদি এমন হতো
এই অন্তিম যাত্রা যদি
আজীবনকাল ধরে চলত
সেই পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ অবধি
অথবা যদি পৃথিবীর সব নিয়ম
ভেঙে চুরে
তুমি আজন্ম কালের জন্য আমার হতে
তবে কী জানো তো
আমাদের বিচ্ছেদে
আমার কোনো ক্ষোভ নেই
ঊর্মি তুমি কি কিছুই বলবে না
পবিত্র
তোমাকে নিয়ে
আমার কোনা অভিযোগ নেই
আছে শুধু প্রেম
তোমার হাত ধরে চলতে চলতে
চার বছর কেটে গেছে
তবুও তোমার ভালোবাসা কমেনি
শেষের বেলাতেও সব একই আছে

আমি চাই
আমাদের প্রেম চিরন্তন থাকুক
আমার লেখায়,
জানি না কোনোদিন দেখা হবে কি না
তবে শেষের বেলায়
শুধু এটুকুই বলবো
"উপন্যাসের শেষের পাতায়
আজও লেখা বাকি
বেলা শেষে আজও
শুধু যে তারেই মনে রাখি"।
কানের কাছে এসে হঠাৎ
আলতো করে বলে উঠলো
আজ মেতেছে পৃথিবী
অজানা কোনো দুঃখের কোলাহলে
সাজিয়ে তারার মেলা
ভালো থেকো প্রিয়
এসে গেছে শেষের বেলা!!

অণুগল্প

শিষ্টাচার ও ছাত্র সমাজ

সায়ম সেখ
বাংলা (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

'শিষ্ট' বলতে বোঝায় পরিশীলিত, শান্ত, সুশীল শিক্ষিত নীতিবান ইত্যাদি। আর আচার বলতে বোঝায়। ছাত্রজীবনেই সদগুনটির অনুশীলন ও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই সময়ই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতির কাল।

সভ্যসমাজে চলতে গেলে এই সভ্য আচরণ একান্তই জরুরি। মনে রাখতে হবে একজন মানুষ নিজে যেভাবে অন্যের ভালোবাসা পেতে চায়, সেভাবে অপরকে ভালোবাসাই হল শিষ্টাচার।

অলঙ্কার যেমন অঙ্গের ভূষণ তেমনি শিষ্টাচার বা সৌজন্য হল মানুষের ব্যবহারের মাধুর্য। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত সভ্য অভিভাবকদের তরফ থেকে ছাত্র-ছাত্রীগণকে এই ভাবে প্ররোচিত করা হয় যেন সত্য মিথ্যা যে কোনো উপায়ে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া এবং শিক্ষান্তে কোনোভাবে যথা সম্ভব অর্থোপার্জনে করাই জীবনের মূল লক্ষ করে তুলে। তাতে যদি বিবেকবোধ, শিষ্টাচার চুলোয় যায় যাক। বর্তমানে সমাজ চরিত্রের একরকম অবক্ষয়ের চিত্র।

ছাত্রজীবনের প্রস্তুতির কাল এবং যেহেতু তারাই ভবিষ্যতের নাগরিক তাই এই সময়েই জীবনের সদর্থক গুণাবলীর অনুশীলনের প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সমাজ জীবন সুস্থ করতে হলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সদগুণাবলীর একান্ত পরিচর্যা প্রয়োজন। নিজের স্বার্থত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহনশীলতার একান্ত প্রয়োজন। সহনশীল না হলে সৌজন্য আসে না। অপরকে সম্মান দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মায় না।

উপসংহার ঃ আমরা আশা করবো বিনয় সৌজন্যে শিষ্টাচার ইত্যাদি সদগুণাবলী ও মধ্যেকার সুমিষ্ট নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরবে। এইভাবে সমান, পৃথিবী পুনরায় একদিন সুন্দর ও সুস্থ স্থিতিতে প্রত্যাবর্তন করবে।

অণুগল্প

ঈদ-উল-ফিতর

মিষ্টু ঘোষ
ইতিহাস অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

৩০ দিন রোজা রেখে, একটা সংযম কাটিয়ে, আসে আমাদের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর অনুষ্ঠান। সকলকে ঈদ মোবারক জানাই। আমি বিশ্বের সমস্ত ধর্মকে সম্মান জানাই। আমি পালন করি সনাতন ধর্ম অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে হিন্দু ধর্ম। আমাদের বিশ্বকবি আমাদের শিখিয়েছেন, নিজ নিজ ধর্মকে পালন করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্মগুলোকেও সম্মান জানাও। তবেই তোমার নিজ ধর্ম সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে।

ঠিক তেমনই বুদ্ধ, চৈতন্য এঁরাও একই কথা বলেছেন। সর্বপরি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস কল্পতরু আরও একটু এগিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে দিলেন। মন্দির-মসজিদ-গির্জা ঘুরে এসে বললেন, যত মত তত পথ। সব ধর্ম সুন্দর ও পবিত্র।

তাই বলেই তো, এই ঈদ-উল-ফিতরকে হৃদয় আবেগে সম্মান জানাই। ঈদ মানেই শুধু খুশির আনন্দ। এখানে আছে একটা ধর্মীয় রীতি-নীতি, একটা ধর্মীয় সংস্কৃতি। যা মানুষের মত মানুষ হতে পথ-প্রদর্শক হিসাবে বারবার ফিরে আসে।

তাই তো, আমাদের এই মহান ভারতবর্ষের একটাই বাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে মহামিলন। যা আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরম্পরা।

সুতরাং বলতেই হয় এই ঈদ-উল-ফিতর কত কিছু দিয়ে যায় প্রতিবছর। শিখিয়ে যায় সু ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ বিনিময়, একে অপরকে ভালোবাসার মানসিকতা। জাগিয়ে তোলে আমাদের মানবিকতাবোধ। অন্ধকারকে ঠেলে দিয়ে আলোর সন্ধান দিয়ে যায়। সেই শুভ মুহূর্তে মনে হয় আমরা যেন একই পরিবারের সদস্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আত্মীয় হয়ে উঠি। কিন্তু আমরা এই সু-মধুর সম্পর্ক ধরে রাখতে পারিনা কেন? উত্তর খুঁজে নিতে হবে। দুঃখ এখানেই। কোথাও যেন আমরা ভুল পথে চলে যাচ্ছি। ভীষণ কষ্ট হয়, বিজ্ঞান-ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করেও মন্দির-মসজিদ-গির্জা নিয়ে আজও ঝগড়া করি।

আমরা মনে রাখিনা সেই চণ্ডীদাসের অমোঘ বাণী —

"খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভিন্ন নেই রে ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

পরিশেষে, সবারে করি আহ্বান। ইচ্ছা শক্তিকে জাগ্রত করে সচেতনতার সঙ্গে অনন্তকাল ধরে —

একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হয়েই থাকবো।
তবেই ঈদ-উল-ফিতরের সার্থকতা।
এখানেই নিহিত আছে আমাদের প্রীতি-ভালোবাসা।

অণুগল্প

হিয়ার হোলি

ঝর্ণা খাতুন
বি.এ. এডুকেশন অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

কলকাতা শহর। অলিগলি সাপের মতো বয়ে চলা রাস্তার নোংরা আবর্জনা। যানজট। এই সবের মধ্যেই বড়ো হয়েছে হিয়া। হিয়া কলকাতার সল্টলেকের এক বস্তির বাসিন্দা। বাবা নেই। একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরে তাদের বাস। তাদের বলতে তার মা ও মামা। তার মা লোকের কাজ করে, ও সে রাস্তায় নোংরা-আবর্জনা কুড়িয়ে ফেরিওয়ালাকে বিক্রি করে টাকা রোজগার করে। তার মামা পঙ্গু। বাড়ির কাজ কোনো রকমে সামলায়। একদিন হোলি এল। সে দেখল সবাই দোকান থেকে পিচকিরি, রং কিনছে ও খেলছে। সে মনে মনে ভাবলো যে, সেও এবার হোলি খেলবে। সে বাড়ি ফিরে এলো ও একটি বালতি নিয়ে দৌড়ে পালালো। সে প্রথমে তার নোংরা-আবর্জনা সেগুলি ফেরিওয়ালাকে বিক্রি করে দিল। পরে অনেক বাচ্চা হোলি খেলছে। সেদিকে পা যখন বাড়াতে যায় দেখে একটি মেয়েকে তার বাবা রং খেলতে দিয়ে গেল। হিয়া বুঝতে পারে যে মেয়েটির নাম তানিয়া। তার বাবা হঠাৎ হিয়ার দিকে তাকায় ও বলে, "আরে! তুমি তো সেই নোংরা কুড়ানো মেয়েটা না; তুমি এখানে কী করছো?

হিয়া ঃ আমি এখানে রং খেলতে এসেছি।

তানিয়ার বাবা ঃ তুমি নোংরা কুড়িয়ে বেড়াও, ওরা তোমার সাথে তাই খেলবে না, খেললেও তুমি যাবে না।

হিয়া দুঃখের চোটে কাঁদো কাঁদো মুখে চলে যাচ্ছিল সেই মেয়েটির বাবাও চলে গেল। হঠাৎ হিয়া দেখে পিছন থেকে কেউ যেন তাকে টানছে। সে দেখে তানিয়া।

তানিয়া ঃ তুমি চলে যাচ্ছো কেন? আসো খেলবো।

হিয়া ঃ কিন্তু তোমার বাবা।

তানিয়া ঃ তুমি বাবার কথায় রাগ করবে না। হোলির দিন সবাই এক।

হিয়ার চোখে জল ছলছল করছিল হঠাৎ তার উপর সবাই রং ঢেলে দেয় ও বলে "বুরা না মানো হোলি হে..."

অণুগল্প

বন্ধু

রিমা ঘোষ
ভূগোল অনার্স (চতুর্থ সেমিস্টার)

আজকাল বন্ধুত্বের ভিড়ে আসল বন্ধু কী সেটা বোঝা বড় দায়। জীবনে যেসব বন্ধু নামক মুখোশধারী মানুষগুলো ছিল তাদের অন্যায়গুলোকে সহ্য করে নিজেকে অনেক ছোট করেছি।

যারা বন্ধু হিসাবে অভিনয় করে তাদের মুখ ও মুখোশ দুই জানি। তবুও তাদের শত্রু ভাবি না। যেহেতু জানি তারা আপন নয়। তবুও কেন যে তারা করে যায় শুধুই বৃথা অভিনয়।

আর রইলো বাকি যারা বলে আমি খারাপ। বদমেজাজি... তাই বন্ধু থাকে না। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি কারোর কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। আপনারা কারা, যে অন্যের নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলাবেন। জাস্ট গেট লস্ট...

যারা চলে গেছে তাদের জন্য কোনোরকম আক্ষেপ রাখতে চাই না। সত্যি বলতে গেলে হাসি পায়। একাকীত্বটাকে উপভোগ করে এখন অনেক ভালো আছি। কিছু মনে হয় না কেও এলে বা গেলে। আজ আমি বদলে গেছি নিজের মতো করে। হ্যাঁ তাইতো আমি ভালোই আছি।

কিন্তু যারা আসলেই আমার বন্ধু হবে তারা থাকবে আর যারা মুখোশধারী তাদেরকে গেট লস্ট। দরজাটা ঐ দিকে। আসতে পারেন আপনারা।

ছোটগল্প

এক গ্লাস দুধের দাম

শবনম বানু
বাংলা অনার্স (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

সাল ২০২০ এই বছরটা সবার জীবনে এক অন্যরকম প্রভাব ফেলেছিলো। গোটা বিশ্ব তথা ভারতবর্ষেও এর বিশাল প্রভাব পড়েছিলো। মহামারির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। 'করোনা ভাইরাস' নামক এক ভাইরাস এই মহামারির মূল কারণ ছিলো। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর হাহাকার। কোথাও দপদপ করে জ্বলছে চিতা, আবার কোথাও গঙ্গার মধ্যে করনা ভাইরাসে মৃত্যু মানুষের লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গঙ্গায় যেন মাছও অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে ভাসমান লাশের সংখ্যায় বেশি, শহরের নানা জায়গায় খোলা হয়েছে ক্যাম্প, যেখানে করনা ভাইরাসের প্রভাব বেশি দেখা দিচ্ছে সে সমস্ত জায়গায় কারফিউ করা হয়েছে। বাইরে থেকে ফেরা মানুষদের তাদের পরিবারের লোকের থেকে দূরে রাখা হচ্ছে ১৪ দিনের জন্য। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে গেলে গোটা ভারতবর্ষের সব জায়গায় লকডাউন করে দেওয়া হয়। দোকান-পাট সব বনধ এমনকি বাড়ির বাইরে বেরোনোও নিষেধ। অন্যসব কিছু তো তবুও ম্যানেজ করে নেওয়া যায় তবে না খেয়ে জীবন কী করে চলবে। তাই খাবার নিয়ে মুর্শিদাবাদের এই শহরটাই হাহাকার পড়ে যায়। যারা একটু বড়লোক তারাতো খাবার সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলো, কিন্তু যারা গরীব, যারা দিন আনে, দিন খায় তাদের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছিলো। সেই শহরে অনাথ বাচ্চাদের একটি হোস্টেল ছিলো। সেখানেও এর প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়েছিলো। সেখানে যে পরিমাণ খাবার স্টকে ছিলো তা ধিরে ধিরেই শেষ হয়ে যায় আর বাচ্চাদের খাবার জন্য কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেখানে থাকা একটা ছোট্ট বাচ্চা রিহান খিদে সহ্য না করতে পেরে, সে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে। সে জানতো যে রাস্তায় পুলিশ ধরলে তাকে মার খেতে হতে পারে বা তাকে অ্যারেস্ট হতে হতেও পারে। কিন্তু পেটের খিদে এতটাই কষ্ট দেয় যে তখন অন্য কোনো কিছুই খেয়াল থাকে না। সেভাবে এখানে থেকে না খেতে পেয়ে মরার থেকে ভালো মনে হয় রাস্তায় বেরিয়ে খাবার খোঁজা। এই বলে বেরিয়ে পড়ে। আর তাতে যদি পুলিশে অ্যারেস্ট করে নেয় তাও ভালো। এইভেবে সে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আর চারিদিকে খুঁজতে থাকে যদি কোথাও একটু খাবারের সন্ধান পায়। খুঁজতে খুঁজতে যখন সে একটা গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল সে দেখতে পায় একটা মেয়ে তার বাড়ির বারান্দায় বসে কিছু খাচ্ছে। সেই মেয়েটিরে রিহান কিছু খাবার দেওয়ার জন্য বলে। বাচ্চাটাকে দেখে মেয়েটার খুব মায়া হয়। এদিকে তার যেমন একটু ভয় ভয় ও করে। কারণ এই সময় বাইরের কাউকে বাড়িতে ডাকা মানা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তবুও সে মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে রিহানকে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে। নিয়ে এসে তাকে বসায় আর তাকে রুটি খেতে দেয়, বাচ্চাটা বলে ওঠে সে তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তারপর মেয়েটি আবার রান্না ঘরে যায় তারপর এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসে বাচ্চাটিকে দেয়। বাচ্চাটি খিদের চোটে এক নিমেষেই সব শেষ করে দেয়। তিনিদিন ধরে না খেয়ে থাকার পরে একগ্লাস দুধ ও রুটিটা তার কাছে অমৃতের মতো লাগে। তার জীবনটা যেন শেষ হয়ে যেতে যেতে বেঁচে যায়। সে খাওয়া শেষ করে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানায়। তারপর বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বাড়ির দরজার পাশের নেমপ্লেটের দিকে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যায়। সেই দেখে মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করে আরো কিছু খাবে তুমি? ছেলেটি বলে নানা আর কিছু খাবো না। এই বলে সে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়।

এরপর আস্তে আস্তে শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হতে থাকে। এবং দেখতে দেখতে অনেক কটা বছর

কেটে যায়। সেই মেয়েটি একজন বৃদ্ধা মহিলা। সে একদিন রাস্তা দিয়ে কিছু একটা কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সেই সময় একটা গাড়ি এসে তাকে ধাক্কা মারে। সে ভীষণ আহত হয় আর রাস্তাতেই তার জ্ঞান হারিয়ে যায়। রাস্তার লোকেরা তাকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে পাশের একটা হসপিটালে ভর্তি করে। তিন-চার দিন পরে তার জ্ঞান ফেরে তারপর যখন সে জানতে পারে যে সে শহরের সবচেয়ে দামি হসপিটালগুলোর মধ্যে একটাই ভর্তি, তখন তার মাথা ঘুরে যায়। জীবন বাঁচার খুশির থেকে তার বেশি টেনশন হচ্ছিল এইভেবে যে কিভাবে এখন সে হসপিটাল এর বিল দেবে। সে একটু একটু করে ঠিক হতে থাকে। সে ভাবতে থাকতে হাসপাতালের বিল দেওয়ার জন্য কি কি বিক্রি করতে হবে।

কয়েকদিন পরেই তার হাসপাতাল থেকে ছুটির দিন চলে আসে। সে এখন পুরোপুরিই সুস্থ। কি জানি কত লাখ টাকার বিল তার হাতে আসবে তার খুব টেনশন হচ্ছিলো। সেভাবে সারা জীবনের জমানো সব সম্পত্তি হয়তো বিক্রি করে তাকে বিল মেটাতে হবে। ছুটি নেওয়ার পর যখন সে নার্সের কাছে বিল চায়, নার্স একটা বিলের ফাইল এনে তার হাতে দেয়, সে ভয়ে ভয়ে প্রথম পাতাটি উল্টে দেখে সে, দেখার পর সে কাউকে আর কোনো কথা বলতে পারে না, শুধু তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, ফাইলের মধ্যে বিল তো ছিলো কয়েক লক্ষ টাকার কিন্তু তার উপরে লেখা ছিলো —

"Bill Fully paid, Thank you for One glass of milk, and Two piece of Bread."

নার্স তাকে বলে যে এই হসপিটালের যে মালিক তিনি তাঁর সব টাকা শোধ করে দিয়েছেন। মহিলা নার্সকে বলে আমি তার সাথে একবার দেখা করতে চাই। তারপর মহিলা কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে জিজ্ঞেস করে — আপনি কে? যে আমার এতো টাকার বিল নিজে দিয়েছিলেন। সেই হসপিটালের মালিক তার কাছে উঠে এসে তাকে প্রণাম জানিয়ে বলে — 'আমি সেই ছোট্টো বাচ্চাটা, রিহান। যে বহু বছর আগে মহামারির সময় খিদের জ্বালায়, শহরের কোনো এক গলিতে আপনার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। না খেয়ে থাকার পরে আমি সেদিন ভেবেছিলাম আমি হয়তো মরেই যাবো। আপনি সেদিন আমার জীবন দাতা হয়ে আমাকে ঘরে ডেকে এক গ্লাস দুধ আর রুটি খেতে দিয়েছিলেন। আমি সেই ছোট্ট বাচ্চাটা যে সেদিন এক নতুন জীবন পেয়েছিলো, শুধু আপনার জন্য। আমি সেদিন বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দরজার পাশের নেমপ্লেট দেখে আপনার নামটা মনে রেখেছিলাম। সফল হওয়ার পর ওখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি ও করেছি, কিন্তু আপনাকে আর পাইনি। আমি চাইনি ঈশ্বর কখনোই আমাদেরকে এভাবে আপনার সাথে দেখা করান। কিন্তু যে দিন আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো আর রাস্তার লোকেরা আপনাকে আমার হাসপাতালে ভর্তি করে। আমি আপনার সাথে থাকা I-Card দেখে আপনাকে চিনতে পারি। আমি ঈশ্বরের কাছে এটুকুই প্রার্থনা করেছিলাম যে যে কোনো এক সময় আমার জীবন বাঁচিয়েছিলো তাকে তুমি রক্ষা কর ভগবান। তাঁর কোনো ক্ষতি তুমি হতে দিয়ো না। এই শুনে সেই বৃদ্ধার চোখের জল যেন থামতেই চাইনা। শেষে বৃদ্ধা মহিলাটি ছেলেটিকে বলে যে — 'একগ্লাস দুধের আর রুটির বদলে লাখ টাকার বিল দিলে তুমি।' রিহান বলে — 'আমার কাছে সেই এক গ্লাস দুধের দাম এই লাখ টাকার বিলের থেকেও অনেক অনেক বেশি, কারণ সেদিনের সেই ছোট্ট সাহায্যটাই আজ আমাকে এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে।'

"Failure is not the opposite of success;
It's part of success."

ছোটগল্প

পনেরো পুরুষ

রহেদা খাতুন
বাংলা অনার্স (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

আরব যখন তার ঘরে মৃতপ্রাণী সাজিয়ে রাখা শুরু করে, অন্তরা তার কারণ জানতে চেয়েছিল আরবের কাছে। আরব তাকে কারণটা বলেনি, আর তাকে জানায়নি ট্যাক্সিডেমি শব্দটার অর্থ কি?

অবশেষে এতবছর পর, আজ আরব একজন দক্ষ ট্যাক্সিডার্মিস্টা। ট্যাক্সিডেমি শব্দের মানে যে চর্মসংরক্ষণ বিদ্যা, সেটা সে তখনও জানত না, যখন থেকে তার মৃত প্রাণী সংরক্ষণ করার শখ। পরে সে জানতে পারে এবং ট্যাক্সিডেমি শিখে, বিভিন্ন মৃত প্রাণীর দেহকে ক্যামিকাল দিয়ে দেহ সংরক্ষণের কাজ শুরু করেছে। এই জীবিকায় সফলতা আনতে গিয়ে সে অন্তরার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেনি। সময় অন্তরার আচমকা মৃত্যুতে একটি দেহ বেড়ে গেল তার ঘরের মৃত প্রাণীর জীবন্ত সমাধিতে। আরব অন্তরাকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসত কিন্তু কাজে দক্ষতা আনতে গিয়ে তার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেনি।

অনেক সিদ্ধান্তের পর সে ঠিক করল, অন্তরার দেহকে সমাধি দেবেন। সে অন্তরার দেহকে ট্যাক্সিডেমি করে সংরক্ষণ করে রাখবে। অন্তত একবার সে তাঁকে দেখতে পারবে। কিন্তু প্রশাসণ তাকে সে অনুমতি দেবেনা। তাই সে ঠিক করল সে যাদুঘরের সাথে তাকে যোগাযোগ করবে। সংরক্ষন এ অনেক লুপ্ত প্রায় জীব আছে, তার আর দর্শনীয় বস্তু হবে অন্তরা। তার আগে দেহ পাঠাতে হল পুলিশের কাছে, মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহ থাকার কারণে। অন্তরার দেহ মর্গে পাঠানো হল, যেখানে দেহ কেটে পরীক্ষা করে সেখানে তার পরিবার, সদস্য, বন্ধুরা মজুত ছিল। তার মধ্যে ডাক্তার জানাল, সাধারণ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। তাই অযথা তার শরীর কেটে লাভ নেই। তাকে পুড়িয়ে দেওয়াই ভালো।

যদিও তাঁরা জানত না অন্তরার শরীরকে ফিরে পাওয়ার জন্য আরব বাড়িতে অপেক্ষা করে আছে। তাই তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এমন অবস্থায় সেই মানুষটি তেরোজন সদস্যের কাছে যখন জানতে চাইল, কার কি প্রয়োজন, তখন একে একে সকলে তাদের বাসনা জানাল।

প্রথম জন... একজন স্বর্ণকার ছিল, তার দৃষ্টি সহজেই পরল অন্তরার দেহের অলংকার। সেই সমস্ত গহনার দামী ধাতু তার দোকানের পক্ষে লাভবান হবে। সে সমস্ত গহনা নেওয়ার দাবী জানাল।

দ্বিতীয় জন... তার স্ত্রী অল্প বয়সে মাথার সমস্ত চুল হারিয়েছে। যদি সে অন্তরার মাথার সুন্দর বাদামি চুল নিতে পারে, তাহলে তার স্ত্রী আবার তার হারানো সৌন্দর্য ফিরে পেতে পারে।

তৃতীয় জন... একটি তরুণ বালক, দৃষ্টিহীন চোখ তুলে জানাল, তার চোখ দুটো নষ্ট হয়েছে। বিজ্ঞানের যন্ত্রও তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেনি। সে অন্তরার দীপ্ত নীল চোখদুটো পাওয়ার আশা জানাল।

চতুর্থ জন... অস্ত্রপাচার জানে। তার দাবী দেহে কোনো আচড় না কাটলে, সেই ত্বক দিয়ে সে আরেকটি এমন মানুষ তৈরী করতে পারবে। অন্য কোনো শরীরে সে এই সৌন্দর্য আনতে পারে। তার এই সমস্ত ত্বক অক্ষত অবস্থায় প্রয়োজন।

পঞ্চম জন... একজন নিঃসঙ্গ প্রেমিক। সে জানাল জীবনে সমস্ত প্রেমে শুধু ব্যর্থতা পেয়েছে সে। তার শূন্য সংসারে হাত ধরার মতো কেউ নেই, তার অন্তরার নিথর হাত প্রয়োজন। চোখ বন্ধ করে যে ওই হাত

ধরে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। সে মৃত হাত কখনোও তাকে ছেড়ে যাবেনা।

ষষ্ঠ জন... চেয়ারে বসে এলে বিকল পা নিয়ে। তার দাবি, তাকে সারা জীবন অন্য মানুষদের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়। সে যদি ওই সুন্দর মসৃণ পা পেয়ে যেত। যার দ্বারা সে আবার নিজের পায়ে চলতে পারবে।

সপ্তম জন... একজন ধর্মযাজক। তিনি লক্ষ্য করলেন অন্তরার চোখের কোণে জল ঝর পরছে। তিনি জানালেন তার ওই অশ্রু বিন্দু প্রয়োজন। পবিত্র জল আজ প্রায় লুপ্ত প্রায় হয়েছে।

অষ্টম জন... খুব দরিদ্র। তার মেয়ে অসুখে ভুগছে। তার কাছে এত টাকা নেই যে মেয়েকে বাঁচতে পারবে সে অন্তরার পোষাকে গুলো চাই। সে পোষাকে তার মেয়ে রাজপরিবারের একমাত্র বালিকার সুখ পাবে ক্ষণিকের জন্য।

নবম পুরুষ হল সেই ডাক্তার, সে অন্তরাকে মৃত প্রমাণ করেছে। সে জানাল দেশ বড়ো রক্তাল্পতায় ভুগছে বর্তমানে। অন্তরার শরীরের সমস্ত রক্ত অনেক মানুষকে সাহায্য করতে পারবে।

দশম পুরুষ জানাল... তার নতুন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। সে তার মেয়ের নাম ঠিক করে ফেলেছে সে অন্তরার নামটা চায়। এটাই হবে তার কন্যার পরিচয়।

একাদশতম, সে একটি ছোটো শিশু। সে জানাল তার জীবন অনাথ আশ্রমে কেটেছে। সে তার মাকে কখনোই দেখনি। তার ধারণা মা আজ জীবিত থাকলে হয়তো অন্তরার মতো হত। সে অন্তরার কোলে মাথা রেখে সামান্য আদর নিতে চায়।

দ্বাদশতম... সে একজন পরিচালক। তাই সে মৃতদেহকে সাজিয়ে (কঙ্কাল) তার ভৌতিক চলচ্চিত্র তৈরী করতে চায়।

ত্রয়োদশতম মানুষটি যার মিউজিয়াম আছে। সে এই দেহকে যাদু ঘরে রাখতে চায়। আর এই দেহ তার স্বামী আরব নিতে আসবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে। তাই অন্তরার দেহ থেকে কেউ কিছুই পাবেনা।

কারও কোনো আশা পূর্ণ হলনা। তবে বাকি ছিল শুধু একজন, দেহ কাটার কাজ করে। তারপক্ষে সকলে জানতে চায়ল। তারা কেউ তো কিছু নিতে পারল না, তবে যদি নেওয়া যেত সে নিত? মানুষটি অন্তরার পোশাকের উপর হাত বাড়াতে বাড়াতে জবাব দিল — "আমার যা প্রয়োজন তা আমি নিয়ে নিই। সব শরীর থেকেই...। এখন সকলে বাইরে যাও। আমি এর পোশাক খুলবো"।

কেউ পোশাক খোলার বাস্তব কারণ জানতে পারল না। তাদের ধারণা চতুর্দশতম মানুষটি অন্তরার পোশাক খুলতে চায়, তার শরীর পরীক্ষা করার জন্য। চতুর্দশতম মানুষ পরীক্ষাও করল। তার পর মৃতদেহ ফিরিয়ে ছিল। পঞ্চদশতম পুরুষ এর কাছে। অন্তরার প্রকৃত মালিক আরবের কাছে।

অন্তরার অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেল আরব। যে খুশি হল, কারণ দেহে কোনো কাটা ক্ষত তৈরী করেনি কেউ। আর তার শরীর থেকে কেউ কিছুই ছিনিয়ে নেয়নি। তবে সে জানতে পারল না, মৃত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরা সবকিছু হারিয়েছে, ওই চতুদর্শতম পুরুষের কাছে। যে পুরুষ মৃতদেহ থেকে সেই সমস্ত কিছু নিয়েছে যা একজন পুরুষের জীবন্ত মেয়ের শরীর থেকে প্রয়োজন। সেই সমস্ত কিছু অন্তরার মৃত শরীরের অনেক গভীর থেকে চুরি হয়ে গেছে গোপনে...

ছোটগল্প

DESTINY

Attitude Queen

"Love is not an attraction...
Love is also not about to find some one...
Love is about to find yourself in another
world..."

দিনটি ছিলো April মাসের 3 তারিখ, সাল 2019। আমার নাম আনিসা। সবাই একটু ভালোবেসে আন্নু বলে ডাকে। এখন দুপুরবেলা, বসে আছি। সবেমাত্র স্নান সেরে এসে বসলাম একটু। এখন ঘড়িতে 3 টে নাগাদ বাজে। আর সামনেই আমার ফোনটাকে চার্জে বসিয়েছি। হঠাৎ করে টুং করে বেজে উঠলো। ফোনটা চার্জ থেকে তুলে নিয়ে ভেজা চুলেই খুব সাধারণভাবে একটা ছবি তুলে whatsapp এ status দিলাম। সাথে একটা caption ও লিখেছিলাম। দেখলাম সঙ্গে সঙ্গেই একটা Friend Status টা Seen করলো। ওর নাম সু। আসলে আমিই ওকে সু বলে ডাকি। School টাইমের বন্ধু আমার খুবই ভালো বন্ধু। স্কুল, টিউশন সবই ছিলো একসাথে দুজনের। আমাদের বন্ধুত্ব এতটোই ছিলো আজও যদি ওর স্কুল লাইফের খাতাগুলো check করা হয় তাহলে দেখা যাবে তাতে ওর চেয়ে আমার Hand Writing -ই বেশি। তবে এখন মাঝে মাঝেই দেখা হয়, ফোনে কথাটাই বেশি হয়, Specialy Whats app -এ বেশি। এখন আমরা সবে মাত্রই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি, স্কুলের গণ্ডি পার করে নতুন নতুন কলেজে ভর্তি হয়েছি, এখন আমার কলেজ আর ওর কলেজও আলাদা। আমি এখন Bengali hons নিয়ে পড়ছি আর ও জেনারেল ডিপার্টমেন্ট ও ভর্তি হয়েছে। সব কিছুই আলাদা এখন আমাদের। পুরোটম আর জেরির মতো ছিলাম আমরা দুজন। যদি আমরা দুজন টিউশনে এক জায়গায় বসতাম তাহলে সেদিন আর পড়াশোনা আর হতো না আমাদের। শুধু ঝগড়া লেগে যেত কথাই কথাই। এমনকি মাষ্টারমশায় আমাদের দুজনকে আলাদা আলাদা জায়গায় বসাতেন। যেদিন আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন টিউশান যেত না, সবাই খুব মিস করত আমাদেরকে। আবার দুজনই টিউশন না গেলে Sir বলতো বাবা রে বাবা যাই হোক আজ বেশ শান্ত আছে পরিবেশটা। কিন্তু আমাদের এই দুষ্টু মিষ্টি লড়াই ঝগড়াটাকে সবাই-ই Miss করত। যাই হোক সত্যি বলতে আমাদের দুজনের Chemistry টা খুব সুন্দর ছিলো।

যাই হোক মূলকথাই আসি - স্ট্যাটাস দেখে সু আমাকে ম্যাসেজ করল — কীরে কেমন আছিস?

(আমি বললাম)

আমি — ভালো রে, তুই কেমন আছিস?

ও বললো — সেই লাগছে তো photo টা তোর।

আমি — oh তাই নাকি?

সু বললো — এই একটা কথা বলবো কিছু মনে করিস না।

আমি — না না বল।

সু — তুই আমার GF হবি খুব ভালোবাসি তোকে রে।। Love U ...

(এসব বলে ha ha ha করে হাসতে লাগলো একটু)।

আমি আর কোনো কথা বললাম না চুপই থাকলাম একটু মুচকি হাসলাম। সত্যি বলতে ওর মুখ থেকে ওই কথাটা আমি Belive করতে পারছিলাম না। কিন্তু ওকে হাসি মজাতে উড়িয়ে দিলাম। তবুও সত্যি বলতে ওর জন্য আমার মনে Feelings School Time থেকেই ছিলো। কিন্তু ওকে আগে কখনো Feel করতে দিইনি। 'বন্ধুত্ব' এর নাম দিয়েই রেখেছিলাম আমি। তবে হঠাৎ ওর মুখের থেকে এইসব কথাগুনে বেশ ভালো লাগছিলো। মনে হচ্ছিল যে যেন আজ যদি আমার মৃত্যুও হয়ে যায় কোনো আফসোস থাকবে না আমার। আমি এতোটা আনন্দে ছিলাম সেটা আমার মুখটা দেখলেই হয়তো বোঝা যেত। সেটা আমি আর কথাই বোঝাতে পারছি না।

দিন যেতে থাকলো আর সাথে সাথে আমাদের কথাবার্তাও বাড়তে শুরু করলো। সকালে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠার পর সবার আগে ওর ম্যাসেজ আসতো 'Good Morning'। একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিলো ও আর সাথে আমিও। প্রতিদিন দুপুরে আমরা কথা বলতাম। রাত্রে ঘুমনোর আগে পর্যন্ত ওর সাথে Chat করতাম। 'Good Night' বলে ঘুমোতাম। ওর সাথে কথা বলাটা যেন এক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিলো। আর এই অভ্যাসটা এতোটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো যে কোনো একসময় কথা না হলে যেন কিছু ভালো লাগতো না। এই পরিণতি বা এই অভ্যাসটা শুধু আমারই হয়নি সাথে ওর ও হয়ে গিয়েছিলো। তবে জানিনা এর পরিণতি কী হবে? দিনগুলো খুব ভালোই কাটছিলো। জানিনা এর মধ্যেই কখন আমিও ওর Feelings গুলোকে কখন Except করে নিয়েছিলাম।

দেখতে দেখতে ২টো মাস কেটে গেলো। আবার সামনেই রমজান মাস, মাত্র দুটো দিন বাকি। সেই রকম আনন্দে সবাই সাথে আমরাও। বিকেল বেলাটা খুবই Special ছিলো দুজনের। কারণ প্রতিদিন দুপুরবেলাতে আমাদের কথা হতো আর দেখা হতো বিকেলে।

প্রতিদিন সেই রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকা, কখন সেই প্রিয় মানুষটা আসবে? আর দেখতে দেখতে সেই চলে যাওয়া তার, আর সাথে মুচকি হাসি। এই রকমভাবেই কাটছিলো দিনগুলো। প্রতিদিনের রুটিন হয়ে গিয়েছিলো এই সমস্ত কিছু।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাস্তার ধারে বসে অপেক্ষা করছি কখন প্রিয় মানুষটার সাথে দেখা হবে, আর তার সেই কিউট হাসিটা। উফ! সত্যিই! এটার জন্যই আমি ওর প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম। সত্যিই কি অপূর্ব যে অনুভূতি সেটা আর বলার মতো নয়।

অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল। দেখলাম আজও আমাদের বাড়ির সামনের ইস্কুল ফিল্টে খেলার জন্য আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য হেঁটে আসেনি। দেখলাম আজ বাইকে আসছে। এতক্ষণ ওকে দূর থেকেই দেখছিলাম। কাছে আসতেই দেখলাম ওর সাথে একটা মেয়েও ছিলো। কিন্তু যাই হোক ওনার বয়সও প্রায় ২৬-২৭ হবে। প্রথমে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি সে শুনি নামি সু এর আন্টিমনি। যদিও পরে সেটা জানতে পেরেছিলাম।

যদিও তখন মনে মনে খুব অভিমান হলো। সু যাওয়ার সময় কিছু বললো না আমাকে ও শুধু একটু

সেই তার Killer হাসিটা দিয়ে চলে গেলো। তবুও মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলো জানিনা কেন? প্রায় ৩০ মিনিট ধরে ওখানেই বসে আছি আমি। ৩০ মিনিট পর সু ওনাকে ড্রপ করে বাড়ি ফিরছিলো। আমাকে বসে থাকতে দেখে ও একটু অবাক হলো। আমাকে গাড়ী থেকেই জিজ্ঞাসা করলো কীরে এখনো বসে আছিস? আমি উত্তরে Just বললাম — hmm রে। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হলো।

রাত্রি ১০টা বাজে এখন। সবেমাত্র Dinner করতে বসেছি, দেখলাম ফোনটা বেজে উঠলো। দেখলাম সু ফোন করছে। আম্মি আব্বুকে বললাম তোমরা খেয়ে নাও, আমি একটু পরে খাচ্ছি। বলে উঠে পড়লাম আমি। সু তখন হয়তো আমাকে দেখেই ও কিছু অনুভব করেছিলো।

প্রথমেই ফোন ধরতেই জিজ্ঞাসা করলো —

'কীরে কী হয়েছে তোর?', 'ওরম Behave করছিস?', Then আমি সব বললাম ওকে। ও তো শুনে সেই রকম হাসতে শুরু করলো, আর বললো আজ বুঝলাম তুই আমাকে নিয়ে কতটা Possesive (পজেটিভ)। আমিও বুঝলাম সত্যিই তো। আমিও একটু হাসলাম। অবশেষে সু বললো — 'পাগলী কোথাকার।'

'আমি শুধু তোরই রে, শুধু তোর।'

সকাল হলো আজ রমজানের প্রথম সেহরি। রাত্রে আজ সেহরী খেতে হবে। আমি তো খুব খুশি রমজান মাস শুরু হলো তাই। সারাদিন কেটে গেল রাত্রি ১ টা বাজে এখন। ঘুম থেকে উঠলাম, রান্না করে আবার সময়ের মধ্যে সেহরী খেতে হবে। খুব Excited আমি ও বলছিলো কাল 'এটা প্রথম রোজা আমাদের একসাথে'। দুজনেই খুব খুশি আমরা। একটু পরে Online আসলাম Whatsapp এ। দেখলাম আমার পাগলটা আমাকে Whatsapp এ Massage করেছে - 'বাবু ওঠো'। তারপর আমি ওকে একবার ফোন করলাম। ও ফোনটা ধরলো না। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে Massage করে পাগলটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আবার ভাবলাম থাক একটু ঘুমোক পাগোলটা। আমি না হয় একদম সেহরি করার ঠিক আগেই ওকে ফোন করে ডেকে দেবো। আজ শেহরির শেষ সময় ৩.৪০ মিনিট। সময় হলো আরো একবার ফোন করলাম আবারও সে ফোন ধরলো না। আমি Whatsapp টা On করলাম দেখলাম ও ম্যাসেজ করেছে — "আমি উঠে পড়েছি রে, তুই সেহরী করেনে।"

খাবার খেয়ে ওকে 'Good Night' Massage করলাম তারপর শুয়ে পড়লাম। এইভাবেই পুরো দশটা রোজা কেটে গেলো। ১০টা রোজা একসাথেই করলাম আমরা। খুব ভালোই কাটছিলো আমাদের দিনগুলো। সেই প্রতি দিনের ফোন ম্যাসেজ কিন্তু আজ আমি একটু ডিপ্রেশান এ আছি। কারণ আজ আমার Computer Class -এর Exam আছে। পড়াশোনা করে উঠলাম এখনি, এখন একটু Redy হয়ে বেরিয়ে পড়বো। ১০টা বাজে এখন ১১.৩০ এ Exam শুরু। যেহেতু Final Exam তাই একটু একটু ভয় ভয় লাগছে। বলতেই সু ফোন করলো একটু কথা বললাম ওর সঙ্গে। তারপর বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে Exam দেওয়ার জন্য। Exam টা বেশ ভালোই হলো। টিচার বললো ১০ দিন পরে Result দেবে। দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে গেল। আজ Result আনতে গেলাম খুব ভয় করছে। কিন্তু তবুও গেলাম। আর Result পেয়ে তো খুব খুশি আমি কারণ আমি Top করেছি। যেহেতু Class Topper আমি Class Teacher আমাকে একটা ডাইরি ও পেন Gift করলো, আর 2nd boy কে একটা ডাইরি আর 3rd girl কে একটা পেন দিলো। Prize গুলো পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি তারপর আমাকে Office এর head mam ডাকলো

সেখানে গেলাম তবে একটু ভয় করছিল হঠাৎ আজ Mam ডাকলো কি জানি কি আবার বলবে... গিয়ে বুঝতে পারলাম Mam আমাকে Congratulation বলার জন্য ওনার Cabin এ ডেকেছিলো। তারপর ওখান থেকে ফিরে Class room -এ আসলাম ভাবছিলাম সু কে একবার বলি যে আমি First হয়েছি। ঠিক তখনি আমার বান্ধবীরা বললো চল কিছু খেয়ে আসি, যদিও এই Computer Center এ আজ আমাদের Last day ছিলো তাই সবাই মিলে ঠিক করলাম একটু ছটোখাটো Party করা হোক। তবে এই Plan এর master mind আমিই ছিলাম। Center এর পাশেই একটা বড়ো রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানেই গেলাম সবাই মিলে। যে যার পছন্দ খেলাম সবাই। শেষে আমি একটা Cake Order করলাম আমার তরফ থেকে সবার জন্য। কারণ আমার আবার মনে হয় Celebrations যতো বড়োই হোক না কেন তাতে যদি একটু Cake না থাকে সেটা আমার সাদামাটাই মনে হয়। আমি কোনো কিছু Celebrate করবো আর আইটেম এ কেক থাকবে না তাই হয়। সবাই মিলে খুব মজা করলাম কেকও খেলাম। এইসব করতে করতে সু কে আর আমার ফোন করা হয়নি। এখন প্রায় ৫টা বেজে গিয়েছে। বাড়ি থেকে একবার ফোন এসেছিলো আব্বু জিজ্ঞেস করছিলো কখন বাড়ি ফিরবো? তাই ভাবছি থাক এখন আর ওকে ফোন করছিনা। বাড়ি গিয়েই না হয় একেবারে ফোন করবো। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোতেই ৫.৩০ বেজে গেল। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে ৬.৩০ বাজলো। বাড়ি ফিরে হয়ে সবার আগে সু কে ফোন করলাম ওকে যখন বললাম আমি First হয়েছি ওতো সেই খুশি। ও বলতে লাগলো — 'আমি Sure ছিলাম যাই হোক আমার পাগলিটাই First হবে'।

দিন কাটতে লাগলো দেখতে দেখতে রমজান মাসটাও চলে গেল। চাঁদ ওঠেছে কাল ঈদ। ইফতার করার পরে মেহেন্দি পরলাম ভিষণ খুশি কারণ কাল ঈদ। রাত্রে সু ফোন করলো। ও জিজ্ঞেস করলো কাল কোথাও ঘুরতে যাবি নাকি? আমি বললাম — কই না তো। এবার কোথাও ঘুরতে যাওয়ার Plan নেই আমার। বাড়ীতেই থাকবো। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম তুই কোথায় কোথায় যাবি ঘুরতে? ও বললো কোথাও না। ওর সাথে কথা বলার পর ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল হলো উঠে দেখলাম ও ম্যাসেজ করেছে 'Eid Mubarak'। আমি ও ম্যাসেজ এর reply করলাম। সকাল দশটা বাজে নামাজ পড়ে খেয়ে ওঠলাম দেখি বাড়িতে ভাই আর বুনু আসলো। ওদের খেতে দিলো মা। ওরা খেয়ে জিদ করতে লাগলো ওদের বাড়ি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু আমি যেতে চাইছিলাম না সবাই বারবার বলার জন্য শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম যাবার জন্য। গেলাম ওদের বাড়ি। দুপুরে সু একবার ফোন করলো কইরে তোকে বাড়িতে দেখতে পাচ্ছি না তাই বলে। আমি বললাম আমি বাড়ি নেই। মামা বাড়ি এসেছি। এটুকু বলতেই ফোনটা কেটে দিলো ও। আমি আবার কল করলাম But receive করলো না। আমি ভাবলাম Bosy আছে হয়তো। পরে আবার একবার Call করলাম তাও receive করলো না। আমি মনে মনে একটু রেগেই গেলাম। ঠিক সন্ধ্যে বেলায় দেখছি একটা Massage করেছে কখন বাড়ি আসবি? আমি সঙ্গে সঙ্গেই আবার কল করলাম তবু Receive করলো না। তারপর আমি আবার Massage করলাম রাত্রে। বাড়ি আসলাম রাত্রে আর ফোন করলো না ও। আবার সকালেও না, আমি আবার দুপুরে ফোন করলাম। তাও Receive করলো না। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি আবার কী করলাম যে ও এরম করছে। কষ্টও হচ্ছিলো খুব, আর সাথে রাগও। রাত্রেও ফোন করলো না First time আমার এতটা time কথা না বলে আছি। সারাদিনটা এমকি রাতটাও কেটে গেল কথা না বলে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। দোষটা কোথায়? হয়তো এখান থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে শুরু হয়েছিল কিন্তু দুজনেই

অজানা ছিলাম। তবে জানিনা কেউ একজন এব্যাপারে জানতাম কিনা।

সত্যিই বলতে আজ মনে হচ্ছে যে ৩ এপ্রিল যতটা খুশি হয়েছিলাম আমি তার চেয়ে আজ বেশি কষ্ট হচ্ছিলো আমার। আমি প্রথম থেকেই আমার ওর প্রতি Feeling টাকে hide করে রেখেছিলাম কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে কিছু সময় চুপ থাকাই ভালো, অন্তত এই যে কষ্টটা আমার হচ্ছিলো সেটা তো হতো না তাই না? আমি শুধু স্বার্থপরের মতো আমারটাই ভাবছিলাম জানিনা সু এখন কি Feel করছে? আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগছিলো। যেমন - ওর ও কী আমার মতো কষ্ট হচ্ছে? ও কী রেগে আছে আমার ওপর? নাকি সত্যিই আমারই দোষ?

এসব প্রশ্ন যখন আমার মাথায় ঘোরাফেরা করছিলো হঠাৎ দেখলাম আমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড ফোন করেছে আমি ফোন ধরেই কথা বলতেই ও বললো কীরে কি হয়েছে তোর আওয়াজ একটু অন্যরকম লাগছে। আমি বললাম একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছে রে। কিন্তু ও তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলো না কারণ ও আমার কান্না ভেজা গলা আর ঠাণ্ডা লাগা গলাটা ভালোই বুঝতো, যদিও আমি এই প্রথমবার ওকে মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। যখনই আমি কোনো কারণে কষ্ট পেয়েছি আমি দেখেছি আমার চেয়ে বেশি কষ্ট ওই পাগলিটার হয়েছে। কিন্তু আর কতক্ষণ দু-একবার না কিছু না, কিছু না করতে করতেই কান্না করতে লাগলাম আমি। আমি মানুষটাও অদ্ভুদ রকমের সারা পৃথিবীর লোকের সামনে আমি হাসি মুখে মিথ্যা কথার আড়ালে নিজেকে খুশি রাখতে পারি কিন্তু এই মানুষটার সামনে নিজেকে সামলাতে পারিনা, কারণ জানি এই মানুষটা সামনে নিজেকে সামলাতে পারিনা, কারণ জানি এই মানুষটা আমাকে সামলে নিবে। আমাদের বন্ধুত্বটা শুধুমাত্র বন্ধুত্ব শব্দটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না ও আমার পরিবারের একটা Part ছিলো Life এর Part যাকে ছাড়া আমি মানুষটা শূন্য। যে আমার সাথে থাকলে I can do everything আর যদি সে না থাকে I'm nothing without her. ওকে ছাড়া আমি আমার Life টা কল্পনা ও করতে পারবো না আর ও আমার জন্য আমার অন্য একটা পৃথিবী যেখানে শান্তিই সবকিছু। থাক এখন আর না, কারণ ওর সম্পর্কে যদি আমি বলতে শুরু করি, তাহলে হয়তো একটা পুরো বছর শেষ হয়ে যাবে তবুও ওকে Describe করাতে পারবো না আমি। ওর নাম নিয়া। নিয়াকে সবকিছু বলালম যে কী হচ্ছে কাল থেকে আমার সাথে। ও আমাকে একটু শান্ত হতে বললো, বললো ডেকেছে সে। তারপর নিয়া আর সু এর সাথে Confarence Call এ কথা হলো আমার। তারপর বুঝলাম ঈদের দিন হুট করে আমার বেড়াতে চলে যাওয়া আর সেদিন সারাদিন দেখা না হওয়ার কারণে ও রেগে গিয়েছিলো যাই হোক এখন সবকিছুই ঠিক ছিলো চলছিলো ভালোই দিনগুলো কিন্তু কেমন যেন দুজনের মধ্যে দুরত্বটা বেড়ে যাচ্ছিলো সময়ের সাথে সাথে।

(আরো একমাস কেটে গেলো)

সকাল বেলা ১০টা মতো বাজে মোবাইল এ সবার status দেখছি বসে বসে দেখলাম সু ওর একটা Photo Status এ লাগিয়েছে। Just একটু পরে সু একটা Photo মুখ hide করে আমাকে whatsapp এ send করে বললো বলতো এটা কে? আমি ওর হাতটা দেখেই বুঝে গেছিলাম ওটা ও। যখন বললাম তোকে আমি চিনতে পারবো না তাই হয়। সু হেসে উঠলো। তারপর আমি ওর কাছে ওই Photo টা চাইলাম। তারপর ও দিতে চাইছিলো না। আমি বেশ কয়েক বারবলার পরও ওর ওই ছবিটা আমাকে দিলো না। আমি রেগে গিয়েছিলাম খুব, ভীষণই রাগ হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত অনেক বার বলার পরও যখন দিলো আমি বললাম

থাক, আর না, অনেক হলো, আর কোনো দিন কোনো কিছু চাইবো না তোর কাছে, থাক তুই! bye !!

Massage Seen করে সঙ্গে সঙ্গেই সু ওর Photo টা পাঠালো। then বললো —

সু — এই রে! তুই রেগে যাচ্ছিস কেনো? আমি জ্বালাচ্ছিলাম রে তোকে! একটা মজা করলাম তোর সাথে।

আমি — মিথ্যা কথা বলিস না, বললাম না দিতে হবে না Photo

সু — ওই! ওরম কেনো বলছিস?

আমি — যা সত্যিই তাই-ই তো বললাম।

সু — পাগলী তোকে রাগাচ্ছিলাম রে।

আমি — থাক। আর না অনেক মিথ্যা বলেছিস। আর না।

সু — তোকে না রাগাতে খুব ভালো লাগে। জানিস তুই না একটুতেই রেগে যাস, আবার একটুতেই খুশি হয়ে যাস।

আমি — তোর আমাকে রাগাতে না, আমার নিয়ে Filling খেলতে ভালো লাগে। তাই না? সত্যিটা বলা শেখ একটু।

সু — এই আমি তোর Fillings নিয়ে খেলি? মন থেকে বলছিস?

আমি — হুম!

সু — মনে রাখিস আমি কারো Fillings নিয়ে খেলি না।

এই বলে সু অফ লাইন চলে গেলো। আমি কিছুক্ষণ পরে রাগ কমে গেলে, আবার ওকে Phone করলাম বেশ কয়েকবার, কিন্তু ও Phone receive করলো না। আমি এটাতো জানি না যে দুজনের মধ্যে দোষটা কার ছিলো আমার না সু এর? কিন্তু এটা বুঝতে ভালোই পারছিলাম সু আমার ওপর অনেক রেগে আছে। আমি জানিনা ওকে কখনো বোঝাতে পারবো কিনা! আজ তো শুধু দুটো কথা বলে ফেললাম তাই ও ওরম Behave করছে জানিনা আমার একসাথে Properly ঠিক থাকতে পারবো কিনা? কিন্তু আজ আমি এটা Feel করছি যেহেতু আমার রাগটা একটু বেশি, আমার রাগের জন্যই হয়তো ওকে হারিয়ে ফেলবো কখনো। ছোটোবেলা থেকে ওকে জানি কিন্তু কখনো সু কে এতো রাগের মেজাজে দেখিনি আমি। যতো বারই আগে ঝগড়া হয়েছে আমাদের কখনো এমন হয়নি যে ও আমার Call receive করেনি বা ফোন ধরে ব্যস্ত আছি এমন বলেছে বা Busy আছি এমন Massage ও করেনি। যখনই ঝগড়া হয়েছে রেগে যতই থাকি দুজনে ফোন Receive করে চুপ করে থাকতাম দুজনেই কথা না বললেও চুপ করে ফোন ধরে থাকতাম কিন্তু আজ —

By the way আমি ওকে মানিয়েই নিবো, রাগ ভাঙিয়ে নিবো, I know coz ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। এটা জানি আমি। রাগ ও যতই দেখাক আমার উপর কিন্তু এক সময় ওর সব অভিমান শেষ হয়ে যাবে। কারণ আমার সাথে কথা না বললে ওর রাত্রে ঘুমই আসে না, সু -এর সাথে আমারও একই অবস্থা। তবু জানিনা দিনটা কিভাবে যে কাটবে? ওই যে কথাই আছে না —

"মানুষ সবচেয়ে রাগ, অভিমান তার উপরেই দেখায় যাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।"

হয়তো আমাদের সাথেও এমন হচ্ছিলো। যাই হোক প্রিয় মানুষটা তার প্রিয়ে মানুষটার ওপর রাগ, অভিমান করবে না তো কার ওপরে তার সমস্ত অনুভূতিগুলো দেখাবে? আর ঝগড়া হলে ভালোবাসাটা আরো দ্বিগুণ হয়। Even মানুষ দুটির মধ্যের Understanding Level টা আরো বেড়ে যায়, দুজনের মধ্যের Bonding টা আরো ভালো হয়।

যাই হোক, I know everything will be fine at night.

এখন শুধুমাত্র রাতের অপেক্ষা।

"প্রিয় মানুষটার সাথে ঝগড়া লড়াই ততক্ষণ পর্যন্ত হয়, যতক্ষণ তার উপর বিশ্বাস আর ভালোবাসার আশা থাকে।

আর যখন তার ওপর বিশ্বাস আর ভালোবাসার আশা উভয় থাকে না, তখন ঝগড়া-লড়াই সব বন্ধ হয়ে যায়।"

প্রবন্ধ

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ঃ উদ্বাস্তু জীবনের বিবর্তনের চালচিত্র

পুলকেশ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় এটা লক্ষণীয় যে কোন শাসকই জনকল্যাণ মূলকভাবে নিজের অবস্থান বজায় রাখতে পারেননি। ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং শোষণ — নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া যেন বিশেষ একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। আবার অন্যদিকে একমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেই জনগণ জেগে উঠেছিল। সেটা যাইহোক শাষকের সংকীর্ণ চিন্তার কারণেই এ মাটিতে বঙ্গভঙ্গ হয়েছে, রদও হয়েছে। শাষক বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু শাষণ ক্ষমতা হারায়নি। পরবর্তীকালে বাঙালির চোখের জলে সাম্প্রদায়িকতার বাষ্প ঢেলে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়েছিল, রদ হয়নি। শাষক বাঙালি ঐ জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিভাজন করেছে, কিন্তু নিজের পরাজয় স্বীকার করে। দুই বাংলার মাঝে কাঁটা তারের বেড়া আজও স্বজন হারানোর বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সব ভেদাভেদ, ধর্মীয় গোড়ামি ভুলে এক হওয়ার স্বপ্ন দেখায়। তারপরও যখন খণ্ডিত বাঙালি মুসলমান হল, তখনও শাষকের চেহারা পূর্বের সকল ইতিহাস মুছে অধিক ভয়ঙ্করূপ ধারণ করে ইতিহাস গড়ল। শুধুই শোষকের উর্বর ভূমি হয়ে উঠল বাঙালির শ্যামলভূমি পূর্ব বাংলা, তাদের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তান। মূলত শোষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়া এবং সে অবস্থান না ছাড়া এ দুইয়ের কারণেই জাগ্রত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, শুরু হয়েছিল গণ বিপ্লব।

বাংলার নাগরিক জীবনে বাঙালি এবং বাংলাদেশি দুই সত্ত্বার অনুভূতির ভিতর আজীবনকাল আনন্দ-বেদনা বাসা বেঁধে আছে। আর এই আনন্দ বেদনার ভাগাভাগি একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ বলেই মনে হয়। একই সঙ্গে একথাও বলা যায় যে সব সময়ই সমাজ — ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান সচেতন মানুষেরা সমাজে সংখ্যালঘু এবং তাঁদের দেখানো পথেই মানুষকে চলতে হয়েছে। যদিও এই চলার পথ মহাকালের প্রবাহে ও সময়ের ব্যবধানে রুদ্ধ।

বাঙালির নিস্তরঙ্গ জীবনে বঙ্গভঙ্গ এবং দেশভাগ দারুণ আঘাত হেনেছিল। প্রথমটিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ সেখানে পরাজিত হয়েছিল ইংরেজ রাজনীতির অশুভ কৌশল; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ইসলামের সহায়তায় পুরোপুরি সফল হয়েছিল বাঙালি সত্ত্বাকে দ্বিখণ্ডিত করতে। বাঙালি জাতি সত্ত্বার ভিতরের বুনট ধর্মের কুটকৌশলে আর মৌলবাদী উন্মাদনায় ভেঙে যায়। পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত, হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি আর পূর্ববঙ্গের মুসলমান ভদ্রলোক শ্রেণির ধর্মগত প্রচারের প্রেক্ষাপট আর জাতিগত থাকেনি ধর্মগত হয়ে গিয়েছিলো। বিফলে গিয়েছিল হোসেন সহীদ সোহারওয়ার্দি-আবুল হাসিম এবং শরৎকিরণ সংকর রায়ের অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন দেখা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে দেখা গেছে ধর্মগত বিষয়গুলো সব সময় উগ্র এবং একপেশে থেকেছে। এর এই উন্মাদনায় যুক্ত হওয়া — মৃত্যু পরবর্তী সময়ের দুঃখ সুখের প্রাপ্তি মানুষকে সচেতন বোধের সামনে দাঁড় করায়। যা এখনো বাংলার বুকে বিদ্যমান। বাংলা ভাগের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন দেখি পশ্চিম বাংলার বুকে বাংলা ভাষা রক্ষা আন্দোলন আর বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী সংস্কৃতি থেকে বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টা তখন হতাশার ভিতর জাল বুনেই ক্ষান্ত হতে হয়। এরূপ প্রেক্ষিতে সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করে বিহারি মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' (১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬) উপন্যাসটি তিনখণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ডের ব্যপ্তিকাল ১৯৪৭-১৯৫৬ পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৯-১৯৬৯। আর তৃতীয় খণ্ড ১৯৬৯-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। এই দীর্ঘ আঠাশ বছর সময় কালের দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল লেখিকা এই উপন্যাসে তা পরিস্ফুট করেছেন। ১৯৪৭ এর দেশবিভাগ, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, সামাজিক শাসন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে প্রেক্ষাপটে রেখে আলী আহমদ এবং পরিবারটির প্রতীকের মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগ এবং বিভাগ উত্তর পাকিস্তানের পরিস্থিতির এক বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন লেখিকা এখানে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এক কঠিন অথচ বিশাল সময়। এই সময়ের শব্দরূপ 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'।

সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার পেছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ সংখ্যালঘু মুসলিমরা স্বদেশ স্বভূমি পরিত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবার পর তাদেরকেও যে কী দুর্বিসহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তার বাস্তব রূপায়ণ আছে। আলী আহমদের পরিবার সেই পরিস্থিতির শিকার। যথা আলী আহমদ ও তাঁর পরিবারকে পূর্ব বাংলার নতুন প্রতিবেশিরা বলতো 'মালাউন'।

আমরা জানি মুসলমানেরা হিন্দুরেই নিন্দাসূচক অর্থে 'মালাউন' বলে থাকেন। কিন্তু এখানেই মুসলমানেরা মুসলমানের প্রতি এই শব্দ প্রয়োগ করে। উদ্ভাস্ত সমস্যার এ একটা নতুন দিক যা সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়। ধর্ম এক হলেও স্বসংস্কৃতি থেকে উচ্ছিন্ন হবার সংকট মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে এই সত্য আমরা অনুভব করি। একমাত্র দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে দেশ ভাগ তারই কুফল ভোগ করতে হয়, এই সব নিরপরাধ মানুষদের। এজন্য তাদেরকে প্রিয় স্বদেশ ভূমি ছেড়ে যেতে হয়। 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসে লেখিকা একদিকটাকে তুলে ধরেছেন মফিজুল ও আলী আহমদ এর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে —

"নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে এই পলায়ন মফিজুল, মেনে নিতে পারছে না। আলী আহমদকে বলে শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য আমাদের পালিয়ে যেতে হচ্ছে কেন আহমেদ ভাই? এই ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তো দেশটা ভাগ হলো। তাই বলে কে কোথায় থাকবে সেটা চিন্তা করার স্বাধীনতা থাকবে না কেন? চিন্তার স্বাধীনতা আছে মফিজুল। কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে কুলিয়ে উঠতে পারিনি আমরা। এখান থেকেও অনেক হিন্দু আমাদের মতো যাচ্ছে"।[১]

স্বদেশ স্বভূমি কেউ সহজে ত্যাগ করতে চায় না। কিন্তু নিরাপত্তার অভাব, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মানুষ বাধ্য হয় দেশ ত্যাগ করতে। আলী আহমদ ও এই কারণেই দেশ ছেড়ে দিলেন। যে কারণেই হোক নিজের দেশ ত্যাগ করে যেতে সকলেরই কষ্ট হয়। পুষ্পিতার অভিব্যক্তি রয়েছে সেই কষ্ট —

"ওই ভাবতে গেলে বুকটাকে কে যেন খামচে ধরে। চব্বিশ বছরের হাজার রকমের দিনগুলো মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি গ্রামে রেখে যাচ্ছে আর কোনো দিন কি ওখানে ফিরে যাওয়া যাবে?"[২]

তাই বহু প্রতীক্ষিত যে স্বাধীনতা তা যে কারও পক্ষে সুখকর বা আনন্দদায়ক হয়নি। এজন্য বাস্তুচ্যুত মানুষ স্বদেশ ছেড়ে যে নতুন রাষ্ট্রে যায় সেখানকার মানুষদের কাছে তারা রিফিউজি বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সকল ছিন্নমূল মানুষকে অস্তিত্বের এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য এরা রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার চাপে পিষ্ট হয়েছে। গভীর অনুভূতিশীল আলী আহমদের উক্তিতে এই বিষয়টি ধরা পড়ে —

"এই পাকিস্তানে ওরা উদ্বাস্তু বলে বিবেচিত হবে। ফলে খাঁটি ঈমান্দার মুসলমান হোক না কেন পাকিস্তানের মুসলমানের কাছে ওরা রিফিউজি। স্বাধীনতার জোয়ারে ইণ্ডিয়া থেকে তাড়া খেয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে এসেছে এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি তাদের ধর্ম মুছে যায় মন থেকে।"[৬]

ভারত থেকে আলী আহমদরা বিরোধিত হতে মুসলিম বলে। কিন্তু এদেশে এসেও এদেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতে পারেননি। মুসলমানত্ব আর বাঙালিত্বের মধ্যে যেন বিভাজন তৈরি করতে চায় এক শ্রেণির গোঁড়া মুসলমান —

"আলী আহমদ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমরা জাতি সত্ত্বায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান। নানা বেশি বোঝে মানাউনির দেশ থেকে এসে মানাউনই হয়ে আছে। ফের বাড়াবাড়ি করলে ওদের লাথি দিয়ে সীমান্ত পার কর।"[৭]

অস্তিত্বের এক বিপন্নতা আলী আহমদকে সমীহিত করে। তাই বাড়ি ফিরে পুষ্পিতাকে জানায় —

"পুষ্পিতা আমার কোন দেশ নেই।"[৮]

পাকিস্তানে এসেও আলী আহমদরা হয়েযান পরবাসী মালাউন। স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে রবীন্দ্র চর্চা করার স্বাধীনতাও তার নেই। পাকিস্তানে প্রতি পদে পদে যে আলী আহমদকে জানিয়ে দেওয়া হয় তিনি সাচ্চা মুসলমান নন। কলেজের প্রিন্সিপাল জানান —

"আপনার দেশপ্রেম সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ভারত থেকে এসেছেন কিন্তু এখনো ভারতের চর হয়ে আছেন দেখছি। ভারত থেকে আসা মুসলমান হওয়ার অপরাধেই বিতাড়িত হয়েছি। নামে মুসলমান হলেও খাঁটি মুসলমান হোয়া যায় না। বেশ তো আপনারাই খাঁটি মুসলমান হয়ে দেশ রক্ষা করুন।"[৯]

পাকিস্তানে মুসলিমদের এই রকম গভীর ক্ষোভেও অভিমানে ফেটে পড়েন আলী আহমদ —

"আমরা তো অচেনা দেশকেই আপন করেছি, আমাদের মরে যেতে হয়, আমাদের ঘর পুড়ে যায়, ফ্যানের জন্য আর্তনাদ করি, ফণিমনসার ঝোপে আমাদের লাশ গেঁথে থাকে, বুটের লাথিতে মুখে রক্ত ওঠে, সব সংস্কার ভেঙ্গে দিয়ে আমরা নগ্ন বিবৃতি দিই বলি, দেখো সভ্যতার বড়াই করে তোমরা কেমন বর্বর আচরণ করতে পারো, যে আচরণ পশুবৃত্তিকেও হার মানায়... তবুও তো আমরা, এই স্বদেশ দিগন্ত দেখি, কীর্তিনাশার গর্জন শুনি, পুঁইয়ের মাচার উপর দোয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং ভাতের জন্য মানুষের আর্তনাদ ভুলে হিংস্র থাবাই মুষ্টিবদ্ধ হবার স্বপ্ন দেখি।"[১০]

পাকিস্তানে প্রতিনিয়ত এই রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানসিক লড়াই চলতে থাকে আলী আহমদের। আলী আহমদের মতো এই উপন্যাসে মুর্শিদাবাদের একটি প্রাথমিক শিক্ষক নজুল্লাহ এবং তাদের পরিচিত কালো খালাও এই পরিস্থিতির শিকার হয়। এঁরাও পাকিস্তানে গিয়ে শান্তিতে বাস করতে পারেননি। নসরুল্লাহের বড়ো ছেলে মফিজুলের কণ্ঠে সেই সত্য উচ্চারিত হয়েছে —

"মফিজুল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, বাবা ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।"[১১]

এই মফিজুলের বাবা নসরুল্লাহ। ভাষা আন্দোলনকারীদের সমর্থন করেছিলেন বলে পাকিস্তানে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর মফিজুল মাতৃভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য সেখানকার পুলিশের

গুলিতে নিহত হয়। ঠিক তেমনি কালো খালার একমাত্র পুত্র গজলে গাজি পাকিস্তানে তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়।

সর্বোপরি সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসে উদ্বাস্তু বিহারিদের অত্যাচারের দিকটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেক বিহারি উদ্বাস্তু হয়ে পাকিস্তানে গিয়ে বিভিন্ন রকম সংকটের মুখোমুখি হয়, কখনো কখনো সেখানকার গোঁড়া মুসিলমদের দ্বারা তাঁরা অত্যাচারিত হন। সেদিকটাই আলোচ্য উপন্যাসে লেখিকা তুলে ধরেছেন। লেখিকা তাই বলেন —

"পূর্ব বাংলায় ওরা বসতি করেছে, জীবিকা খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু এই এলাকার মানুষ হতে পারেনি।"[৯]

তথ্যসূত্র

১) সেলিনা হোসেন - 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' সময় প্রকাশন, ঢাকা অখণ্ড সংস্করণ, প্রকাশকাল ২০০০। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৮
২) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২।
৩) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৮।
৪) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৮।
৫) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯৬।
৬) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯৯।
৭) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৭।
৮) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৩।
৯) তদেব। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৮১।

সহায়কগ্রন্থ

১) নীল কণ্ঠ পাখির খোঁজে - অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় - করুনা প্রকাশনী, মার্চ-২০০৯
২) কেয়া পাতার নৌকা - প্রফুল্ল রায় - করুনা প্রকাশিনী - কোলকাতা
৩) আগুন পাখি - আজিজুল হক - দে'জ পাবলিশিং কোল -
৪) সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা - সমরেশ বসু - কোলকাতা, ১৯৬৯
৫) সংসপ্তক - শহীদুল্লাহ কাউসার - জোনাকি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৫
৬) দণ্ডক থেকে মরিচঝাপি - শক্তিপদ রাজগুরু - কোল, ১৯৬৫
৭) সুপরিবনের সারি - শঙ্খ ঘোষ - অরুনা প্রকাশনী - কোল, ১৯৯০
৮) বাংলা উপন্যাসে দেশ ভাগ ও ভগ্নীড়ের বেদনা - হেনা সিনহা - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোল।
৯) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর - আবুল মন্সুর আহমদ।
১০) বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন - তাপস ভট্টাচার্য্য - পুস্তক বিপনি, কোল।

প্রবন্ধ

লিঙ্গ সাম্য ঃ তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক অধিকার

পিয়ালী দাঁ
সহকারী অধ্যাপিকা (ইতিহাস বিভাগ)

Gender Equality -র কথা বললে প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে পুরুষ শাষিত সমাজে মহিলাদের অবস্থা ও অবস্থানের কথা। কেননা আমাদের সমাজে জেণ্ডার বা লিঙ্গ শব্দটির দ্বারা বাইনারি জেণ্ডার স্ট্রাকচার বা দ্বৈত লিঙ্গ কাঠামো অর্থাৎ নারী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এই দুই লিঙ্গের বাইরেও আরও এক শ্রেণীর মানুষ আমাদের সমাজে বাস করে যাদের আমরা দেখতে পাই ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়ানো গাড়ির জানলায় টোকা দিয়ে টাকা চাইতে বা ট্রেনের যাত্রীদের কাছে হাত পাততে বা সদ্যোজাত শিশুর আবির্ভাবে নাচ গান করে উপার্জন করতে। এরা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ - Transgender. যদিও Transgender শব্দটি এই শ্রেণির মানুষের যথার্থ ব্যাখ্যা দেয়না কেননা ট্রান্স শব্দটির আভিধানিক অর্থ beyond, across অর্থাৎ ছাড়িয়ে যাওয়া বা অতিক্রম করে যাওয়া। সুতরাং Transgender বলতে বোঝায় যারা সমাজ নির্ধারিত লিঙ্গের সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এরা সমাজ নির্ধারিত কোন সীমাকে অতিক্রম করেনা। বরং বলা ভালো সমাজে তার নিজের সীমায় এদের প্রবেশ করতে দেয়না।

সাধারণতঃ ট্রান্সজেণ্ডার বলতে এমন এক লিঙ্গ অবস্থাকে বোঝায় বা সমাজ নির্ধারিত দ্বৈত লিঙ্গশ্রেণির মধ্যে অর্থাৎ ছেলে বা মেয়ে কোন শ্রেণিতে পড়েনা। এই লিঙ্গের মানুষেরা শারীরিকভাবে পুরুষ হয়েও নিজেকে নারী হিসাবে উপলব্ধি করে বা শারীরিকভাবে নারী হয়েও নিজেকে পুরুষ হিসাবে উপলব্ধি করে বা শরীরে দুটি লিঙ্গের পরিচয় বহন করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, ক্রোমোজম সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার কারণে একটি শিশু তৃতীয় লিঙ্গের হয়ে জন্মায়। হিন্দিতে এদের বলা হয় কিন্নর। সংস্কৃতে নপুংসক শব্দটির বহুল প্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই community কে বোঝানোর জন্য কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা হয় যেমন - হিজড়া, আরবানি, যোগতা, যোগাপ্পা, শিবশক্তি ইত্যাদি। বর্তমানে বৃহন্নলা শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষিত হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের উপস্থিতি ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু দেবতা শিবকে প্রায়ই অর্ধনারীশ্বর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে একই দেহে পুরুষ ও মহিলা প্রতিকৃতি আছে। সাধারণত, অর্ধনারীশ্বরের ডানদিক পুরুষ এবং বামপাশ মহিলা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাচীনকালে এঁদের সম্মানও খুব কম ছিল না। তবে সম্মানের থেকে সহানুভূতি ছিল বেশি। সেই সহানুভূতিরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রামায়ণে। কথিত আছে, রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করে বনবাসে যাত্রা করেন, তখন অযোধ্যার সমস্ত প্রজাবর্গ তাঁর সঙ্গে বনের পথে যাত্রা করে। কিছুটা পথ চলার পর একটি জায়গায় এসে রামচন্দ্র অযোধ্যার সমস্ত নারী পুরুষদের তাদের গৃহে ফিরে যেতে বললেন। তারপর রামচন্দ্র চলে গেলেন বনবাসে। স্ত্রী-পুরুষেরা ফিরে গেল অযোধ্যায়। অবশেষে বারো বছর পর বনবাস কাটিয়ে রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন অযোধ্যার কাছাকাছি এসে দেখলেন, ক্লীব-নপুংসকেরা সব দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অপেক্ষায়। তাদের শরীর কৃশ, মাথায় চুলে জটা। রামচন্দ্র জানতে চাইলেন তাদের এহেন আচরণের কারণ। তাঁরা জানালেন,

রামচন্দ্র স্ত্রী-পুরুষদের ফিরতে বলেছিলেন অযোধ্যায়, কিন্তু ক্লীব-নপুংসকদের নয়। তাঁদের ধৈর্য ও ভালবাসা দেখে রামচন্দ্র খুশি হয়ে তাদের মঙ্গল-কর্মের সূচক হওয়ার আশীর্বাদ দেন। বিবাহ-পূর্বে অনুষ্ঠানে হিজড়েদের আগমন মঙ্গলের সূচনা করে বলে মনে করা হয়। সন্তান জন্মের পর বাড়িতে তাঁদের আসাটাও মঙ্গলের সূচক। এই কাহিনীটি আমাদের সামনে একটি শিক্ষামূলক দিক উপস্থাপন করে, তাঁর আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে রামচন্দ্র যেমন এদের ভুলে যাওয়ার ভুল সংশোধন করেছেন তেমনি আমরা যেন তাঁদের ভুলে না যাই, সে জন্য আমাদেরও সচেতন করেছেন।

শুধু রামায়ণ নয়, আরেক মহাকাব্য মহাভারতেও রয়েছে এমন নারী-পুরুষের মিশ্রণ চরিত্র, যাদের আমরা আজকাল বলি তৃতীয় লিঙ্গ। মহাভারতের এইরকম একটি চরিত্র শিখণ্ডী যিনি ভীষ্ম বধের জন্য তাঁর লিঙ্গ পরিবর্তন করেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনও অজ্ঞাতবাসের সময় বৃহন্নলা নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিরাট রাজার রাজ্যে রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের সংগীত ও নৃত্যকলার শিক্ষাদান করেছিলেন। তিনি যথেষ্ট মর্যাদার সাথে বিরাট রাজার অন্দর মহলে বাস করতেন। হিন্দুশাস্ত্র 'ইলার কাহিনী'তে ইলা ছিলেন এক রাজা। তিনি শিব ও পার্বতীর অভিশাপে একমাস পুরুষ রূপে এবং পরবর্তী একমাস নারী রূপে দেহধারণ করতেন। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে। এছাড়া হর্ষবর্ধনের লেখা 'রত্নাবলী' নাটকেও এই বর্ষবর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নপুংসক অর্থে। তাঁরা রাজবাড়ির অন্দরমহলে রক্ষকের কাজ করতেন; একই কথা আছে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'য়, কিন্তু তিনি 'বর্ষবর' না বলে শব্দটাকে ধরেছেন 'বর্ষধর' বলে। পুরাণে, তিন ধরনের দেবদেবীর গান ও নাচ উল্লেখ আছে : অপ্সরা (মহিলা), গন্ধর্ব (পুরুষ) এবং কিন্নর (উভয় লিঙ্গ)। মধ্যযুগেও এরা যথেষ্ট মর্যাদা ভোগ করতেন। ডাচ বণিক পেলসার্টের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে এদের সামাজিক ক্ষমতা, সম্মান ও বিলাসবহুল জীবনের কথা জানা যায়। এরা মুঘল হারেমের মহিলাদের সাথে বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। প্রশাসন, রাজনীতি, সাম্রাজ্যের গোপন সংবাদ আদান-প্রদানে তারা অংশগ্রহণ করত।

ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাতে এরা ক্রমাগত নিজেদের জায়গা হারিয়ে ফেলে। ভারতীয় সমাজে উপেক্ষার পাত্রে পরিণত হয়। এখনো পর্যন্ত এরা কারো কাছে আতঙ্কের, কারো কাছে ঠাট্টার এবং কারো কাছে কৌতূহলের বস্তু। তাদের অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্তা, ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর এবং অদ্ভুত রকম তালি বাজানো সবকিছুই ছিল ভিন্নরকম ও বিনোদনের খোরাক। আমরা অনেকেই জানি না বলা যায় জানতে চাইনা এরা কারা? কেমন তাদের জীবনযাত্রা? কেন তারা আর দশজনের মতো স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহ না করে দোকানে দোকানে ঘুরে টাকা তোলে, অনুষ্ঠানে গিয়ে নাচ গান করে বেড়ায়? এদের সমাজ জীবন আমাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। এরা নিজেদের জন্মের জন্য দায়ী নয়, কিন্তু সমাজ এদের অভিশপ্ত গণ্য করে। এমন কি এদের নিজেদের আত্মীয় স্বজনেরা এদের দূরে সরিয়ে রাখে। কখনো কখনো তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানের লজ্জা ঘোচাতে জোর করে সমাজ স্বীকৃত নারী পুরুষের ছাঁচে ঢেলে দিতে চায় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে।

আবার অনেকসময় বাবা মায়েরা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কথা ভেবে শিশুটিকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের হাতে তুলে দেওয়াই শ্রেয় মনে করে। আবার অনেক সন্তানকে নিজের কাছে রেখে দেয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশুটি বড় হয়ে স্বেচ্ছায় অংশ নেয় তার নিজের মতই অবহেলিত ও বঞ্চিতদের মহল্লায় আশ্রয় নেয় যা তাকে অস্তিত্বহীনতা ও একাকীত্ব থেকে বাঁচায় এবং মানসিকভাবে প্রশান্তি দান করে। হয়ত

পারিপার্শ্বিক অবহেলা, অবজ্ঞা ও কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য তাকে বাধ্য করে সমাজ থেকে বহির্ভূত এই জীবনে প্রবেশ করতে। এখানেই তাদের শেখানো হয় নাচ, গান এবং দু-হাত দিয়ে কিভাবে অদ্ভুত তালির আওয়াজ সৃষ্টি করা যায়। এভাবেই তৈরি করা হয় তাদের অস্বাভাবিক জীবন পথের প্রতিকূলতায় অস্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার কৌশল।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের এই অবমাননার কিছুটা হলেও আইনি লাঘব হয় ২০১৪ সালে। NALSA (ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি) এবং রাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া মামলায় যুগান্তকারী রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট, যেখানে ট্রান্সজেণ্ডার মানুষদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আরও বলা হয় যে তাঁরা সমস্ত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের। NALSA রায়ের আর এক প্রগতিশীল দিক হল এই রায়ে ট্রান্সজেণ্ডার কম্যুনিটিকে প্রান্তিক সম্প্রদায় হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় এবং শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ ও.বি.সি. কোটার ২৭% সংরক্ষণের মধ্যে ট্রান্সজেণ্ডার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলা হয়। নথিপত্রে এই সংরক্ষণের কথা বলা হলেও কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাঁরা সমাজের অঙ্গ অথচ তাঁরা প্রান্তিক, অস্পৃশ্য, অদ্ভুত হয়েই রয়ে গেছেন সমাজে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্রান্সজেণ্ডার মানুষদের জন্য চাকরি সংরক্ষিত করার পরও পরিকাঠামো এবং সুরক্ষিত পরিবেশের অভাবে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায়নি। আমরা জানি শিক্ষা মুক্তি আনে কিন্তু আমি বলব শিক্ষা ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। ক্ষমতা ছাড়া এই সমাজে নিজের জায়গা তৈরি করা সম্ভব নয়। শিক্ষা ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। ক্ষমতা ছাড়া এই সমাজে নিজের জায়গা তৈরি করা সম্ভব নয়। শিক্ষা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, সুস্থ স্বাভাবিক কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজ একজন তৃতীয় লিঙ্গের শিশুকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পুত্র বা কন্যা সন্তানের বাবা মায়েরা নিজেদের সন্তানকে এদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে যা শিশুটিকে একাকীত্বের দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়াও সহপাঠীদের টিপ্পনি, অশ্লীল মন্তব্য, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় তার শিক্ষার অধিকার।

প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায় এবং কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই সমান মানব মর্যাদা ভোগ করার অধিকারী। সাংবিধানিকভাবে তারা বিভিন্ন মৌলিক অধিকার যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি মর্যাদা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী। কিন্তু ভারতীয় সমাজে তারা অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়ে চলেছে। ট্রেনে, বাসে রাস্তায় বৃহন্নলাদের দেখে বিরক্তিতে মুখ বেঁকে যায় অনেকেরই, সমাজে এখনো তারা ব্রাত্য। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে লিঙ্গ এবং যৌনশিক্ষার অভাবে মানুষের মনে ভয়, ভীতি, ঘৃণা এবং অমার্জিত কৌতূহল রয়ে গিয়েছে যা প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের বারবার বিবিধ বৈষম্যের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং এই মানুষগুলো সমাজের মূল স্রোতের সাথে দূরত্ব বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সাথে এই বিশাল দূরত্বই তাদের সম্পর্কে আমাদের করে রেখেছে অজ্ঞ আর তাদের করে রেখেছে অবজ্ঞার পাত্র। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হয়ে জন্মানো কোন রোগ, পাপ বা অপরাধ নয়। নারী পুরুষ লিঙ্গ পরিচয়ের মত এটিও একটি লিঙ্গ পরিচয়। ওরা চায় সমাজে ওদের মানুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো ওরা সমাজের সঙ্গে, পরিবার পরিজনদের সঙ্গে বসবাস করতে চায় একটা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। আমরা যদি এই সমাজ থেকে ওদের পাওনাটুকু পাওয়ার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াই তবেই ভারতে লিঙ্গ সাম্য স্থাপিত হবে।

প্রবন্ধ

বাংলার লোকনৃত্য

চন্দ্রানী পাল
সহকারী অধ্যাপিকা (ইতিহাস বিভাগ)

আজ অবধি পুরানো যে ছবি পাওয়া গেছে তা কমবেশী ২০,০০০ বছরের পুরানো বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতে নাচের প্রাচীনতম যে প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া যায় তা মধ্যপ্রদেশের ভূপাল অঞ্চলের ভীমবেটকায় একটি গুহাচিত্রে। আদিম যুগ থেকেই শিকার, জাদুমন্ত্র, রোগনিরাময়, ভূতপ্রেত ইত্যাদি ভাবনার সাথে নৃত্যের যোগাযোগ ছিল তা বিভিন্ন গুহা চিত্রগুলি থেকে জানা যায়। এরপর মানুষের উন্নতির সাথে সাথে কৃষি অর্থাৎ ফসল উৎপাদন, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু সব কিছুর সাথে সাথে নৃত্যগীত জুড়ে যেতে শুরু করে। প্রাচীনকালে নরনারীর যৌথ নৃত্যও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রাম বাংলার মানুষদের নৃত্যে গীত বাদ্য খুব সহজভাবে মিলেমিশে গেছে।

গ্রাম বাংলায় লোকনৃত্যের সঙ্গে মূলত বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ, ধর্মের বিভিন্ন দিক এবং এর সাথে সাথে উৎসব অনুষ্ঠানেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে আছে। বিভিন্ন নাচের অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে জাদু শক্তিকে ক্রিয়াশীল করা বা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৃত্যের দিক থেকে বলা যায় যে কোন ভাবাবেগ যখন কোন গোষ্ঠী জীবনকে আলোড়িত করতে পারে তখন লৌকিক সমাজের প্রতিক্রিয়া বা প্রকাশ হিসাবে নৃত্যকে গণ্য করা যেতেই পারে। আবার প্রকৃতিকে দেবতা বেশে তুষ্ঠ করার জন্য মেয়েরা নৃত্যগীতে মিলিত হয় যা উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গাতে দেখা যায়। এইভাবে দেবতাকে আবেদন নিবেদনের জন্য নৃত্যকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় প্রাচীন যুগ থেকেই, পরবর্তী সময় আবার দেবতাদের রূপে সজ্জিত হয়ে পালা নাচ করার রীতিও প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন ধরনের লৌকিক বিশ্বাসকে সামনে রেখে বিভিন্ন নৃত্যরীতির প্রচলন শুধু ভারত তথা বাংলায় নয় সারা বিশ্বেই এই ধরনের লোক নৃত্যের ভাবনা প্রচলিত আছে। যেমন — মালয়েশিয়াতে বসন্ত নৃত্য, আফ্রিকার নরনারীদের মিলনসূচক নাচ, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যেও এই ধরনের লোকনৃত্যের প্রচলন দেখা যায়।

লোকনৃত্যের মূল কেন্দ্রে রয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। প্রাচীনকালে এর সঙ্গে মিশে ছিল অলৌকিক বিশ্বাস, ধর্ম কেন্দ্রিকতা ধীরে ধীরে এই সব কিছু অতিক্রম করে লোকনৃত্যের উদ্ভব ও তা যুগের সাথে সাথে এগিয়ে নিয়ে চলতে চলতে বর্তমানে লোকনৃত্যগুলি হয়ে উঠেছে পৌরাণিক পালা। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ছৌ। বিভিন্ন মুখোশ পরিহিত ছৌ শিল্পীরা নৃত্যের সঙ্গে সংলাপ ও গানকে এমনভাবে জুড়ে নিচ্ছেন যুগের সাথে সাথে তা এখন লোকনাট্যের রূপ নিচ্ছে।

লোকনৃত্যের মূল কেন্দ্র ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। প্রাচীনকালে এর সঙ্গে মিশে ছিল অলৌকিক বিশ্বাস, ধর্ম কেন্দ্রিকতা ধীরে ধীরে এই সব কিছু অতিক্রম করে লোকনৃত্যের উদ্ভব ও তা যুগের সাথে সাথে এগিয়ে নিয়ে চলতে চলতে বর্তমানে লোকনৃত্যগুলি হয়ে উঠেছে পৌরাণিক পালা। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ছৌ। বিভিন্ন মুখোশ পরিহিত ছৌ শিল্পীরা নৃত্যের সঙ্গে সংলাপ ও গানকে এমনভাবে জুড়ে নিচ্ছেন যা যুগের সাথে সাথে এখন লোকনাট্যের রূপ নিচ্ছে।

লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। যেখানে কঠোর নীতির থেকে সরে গিয়ে দলবদ্ধভাবে কিছু নির্দিষ্ট বা অনেক সময় গতি, ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি যে বাস্তবের জীবনের সাথে মিলিতভাবে তৈরী সেই রীতিতেই লোকনৃত্য সংগঠিত হয়। এর সাথে গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। পোষাক পরিচ্ছদের খুব বৈচিত্র্য না থাকলেও সব লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে যে এলাকার নৃত্য সেই এলাকার বেশভূষা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বাংলায় মূলত তিন ধারায় লোকনৃত্য প্রচলিত আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন — ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। সাধারণ গ্রামীণ বাংলার মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে বেশীরভাগ ধর্মীয় প্রভাবই বেশী দেখা যায়। যেমন — বাউল, গম্ভীরা ইত্যাদি নাচ হিন্দু ধর্মীয় এবং জারি নাচ, ফকির নাচ ইত্যাদি মুসলিম সংস্কৃতির ধর্মীয় আচারের সাথে মিশে যায়। আবার কিছু লোকনৃত্য যেমন ঘাটুনাচ, লেটো, ছোকরা ইত্যাদি নৃত্যের ক্ষেত্রে সব ধর্মের মানুষই অংশগ্রহণ করতে পারে। আবার সামাজিকভাবে ঢালি নাচ, ডাক নাচ ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে সেগুলিকে যুদ্ধনৃত্য বা শক্তি প্রদর্শনের কথা বলা হয়ে থাকে। আবার নতুন বাচ্চা জন্মানোর জন্য, ফসল নতুন ওঠার জন্য, মানুষের আনন্দ উপভোগ করার জন্য বিভিন্ন নৃত্যের প্রভাব আমরা গ্রাম বাংলায় দেখতে পাই। যেমন — করম নাচ, ধামাইল নাচ।

তিন ধারার নৃত্য পরিবেশনা লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেলেও বেশীরভাগ নৃত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব কোন না কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। যেমন — পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় গম্ভীরা নাচ দেখতে পাওয়া যায়। এক সময় যাতে কৃষিকার্য সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে শুরু হলেও কালক্রমে তা ভক্তিমূলক নৃত্যানুষ্ঠানেই পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভাব বা কোন অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য বা প্রয়োজনীয়তাকে একটি ধর্মীয় রূপ দিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে উৎসর্গ করাই হল যে কোন লোকনৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গম্ভীরা মূল শিবের ঠাকুরের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের উত্থানের সাথে শৈব ধর্ম চলতে থাকে — এবং প্রভাব হিসাবে শিবের বন্দনার প্রচার দেখা যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় মুখোশ পরিহিত গম্ভীরা বিভিন্ন নামে গাজন, নীল, গম্ভীরা নৃত্য নামে পরিবেশিত হতে থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসের পৌষ সংক্রান্তিতে করা হয় লৌকিক কুমারী দেবী টুসুর আরাধনা যাতে মূলত মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে। বয়স্ক মহিলারাও এতে অংশগ্রহণ করে। টুসুর দল নৃত্য গীতের মাধ্যমে দেবী বিসর্জন দেয়। আবার একই নামে প্রচলিত হলেও ঝুমুর বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন রূপে দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে ঝুমুর লোকমুখে প্রচারিত হত। ফলে পদগুলির লিখিত রূপ পাওয়া যায় না, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ঝুমুর তত্ত্বকথার সাথে সাথে সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিররতার চিত্র আবার অনেক সময় ব্রিটিশ বিরোধিতার চিত্রও ফুটে উঠতে দেখা যায়। আবার এই ঝুমুর সম্প্রদায়ে সাথে পরবর্তী সময় জুড়ে গেল নাচনি সম্প্রদায়, পুরুলিয়া বা পূর্বের মালভূমি এই অঞ্চলের ছৌ বিশ্বব্যাপী যার প্রচার। তাছাড়া ভাদু, টুসু, বাঁদনা, করম সবই ঝুমুরের সাথে জড়িত এবং ঝুমুরের প্রতিপালক হচ্ছে নাচনি সম্প্রদায়।

গ্রামীণ লোকনৃত্যের মধ্যে বেশীরভাগই নিজেদের অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। তার মধ্যে বিশ্বের দরবারে বেঁচে আছে ছৌ নৃত্য। এখনও এই নাচের কদর বেশিরভাগ জায়গায় দেখা যায়। লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্যের সংখ্যাই বেশি তারমধ্যে বলা যেতে পারে কাঠি নাচ, রায়বেশে, আলকাপ নৃত্য, মেছেনি নৃত্য, ডাঁচো নাচ, নাটুয়া নাচ, দাসাই নৃত্য ইত্যাদি।

প্রবন্ধ

কবিতা ও বাস্তবতা

ইনজামামউল হক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (বাংলা বিভাগ)

'কবিতা ও বাস্তবতা' এই শিরোনামে লেখা। মানুষের জীবনে বস্তুর অভিব্যক্তি ঘটে নানাভাবে। নিত্যদিনের জীবনচর্চা কখনো অমিতব্যয়ে, কখনো বিলাসিতায়, কখনো অনাবশ্যক বাজে কাজে, কখনো বা অলস মন্থর জীবনযাপনে সাধিত হয়। আজকের দিনের এই মানসিক অপব্যয়িতার বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে জীবনে আনন্দের স্পর্শ আনতে মানুষকে বৈচিত্রের সন্ধান করতে হয়, জীবনকে সুন্দর সুষ্ঠরূপ আর দেখার অভিলাষী হয় সে। সাহিত্যই সেই দায়িত্ব পালন করে। আর সে সাহিত্য জীবনে যা অসুন্দর ও কুৎসিত, তাকেও সাহিত্যিক তাঁর অসাধারণ শিল্পচাতুর্যে সুন্দর করে গড়ে তোলেন এবং সে কারণেই আমাদের দৃষ্টিতে তা অপরূপ রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাস্তবের আশ্রয়ে সে সাহিত্য লিওনার্দের সেই অনবদ্য শিল্পকর্মের মতোই তা কালের কষ্টিপাথরের উত্তীর্ণ হয়, চিরকালের সম্পদরূপে বেঁচে থাকে।

কবি Wordsworth বলেছেন — "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings" - অর্থাৎ ব্যক্তিগত কল্পনার স্বতোৎসারিত ভাবোচ্ছ্বাসই হল কবিতা। আবার কেউ কেউ বলেছেন কল্পনার ভাবোচ্ছ্বাসই কবিতা। প্লেটো বলেছিলেন কবিদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করা উচিৎ। কবিরা ভাব কল্পনাকে আশ্রয় করে থাকে। সত্যিই কি তাই? তাঁরা কি শুধু ভাবকল্পনা আশ্রয় করে থাকে? কবিদের মধ্যে কি বাস্তবতার কোন ছোঁয়া নেই? আমরা যদি প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করে দেখি তাহলে দেখতে পাব প্রাচীন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত লেখাই কবিতার আকারে। এইসব লেখার মধ্যে শুধু কি কল্পনা? আসলে যুগে যুগে কবিরা তাঁদের লেখার মধ্যে যুগ - সঙ্কটকে তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ সেখানেও দেখব অধ্যাত্ম সাধনার আধারে বিভিন্ন বাস্তব প্রসঙ্গ এসেছে, এসেছে লৌকিক জীবনের কথা। সেকালের দরিদ্র, অবিহেলিত, পরিত্যক্ত ব্যাধ, শবর, ডম প্রভৃতি জাতির মধ্যে দিয়ে ওঠে এসেছে বাস্তব জীবনের চিত্র। এমনই একটি চিত্র খুঁজে পাই চর্যাপদের ৩৩ নং পদে —

"টালত ঘর মোর নাহি পড়বেশি।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।" (ঢেনঢন পাদ)

অর্থাৎ টিলার উপরে আমর ঘর, প্রতিবেশি নেই। হাঁড়ীতে ভাত নেই, (অথচ) নিত্য অতিথির আনাগোনা। আগেই বলেছি চর্যার কবিরা তাঁদের অধ্যাত্মবোধ প্রকাশ করতে অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁদের দৃষ্ট সমাজের অসংখ্য তথ্য ব্যবহার করেছেন। আর তা কখনোই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে নয়।

চর্যাপদ যেমন প্রাচীনযুগের প্রথম ও একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন, তেমনি মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে (রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা উপজীব্য) পৌরাণিক উপাদান থাকলেও লৌকিকতা মিশে আছে কাব্যের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই প্রভৃতি চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে কাব্যের সেই বাস্তবতা ধরা পড়ে। তাই দান-নৌকা-যমুনা-হার-বংশী প্রভৃতি খণ্ডে রাধাকৃষ্ণের অপৌরাণিক বিষয়গুলো উঠে আসে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা সুস্থ তেজস্বিনী প্রাণোচ্ছলা। দেহে ও মনে কোন দুর্বলতা নেই। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, মনে সতীত্ববোধ গেঁথে আছে। সংস্কার তার চির সম্পদ অবস্থাপন্ন ঘরের বধূ - সে কারণে গর্বও অল্প নয়, — "বড়ার বৌহারী আম্মো বড়ার ঝী", স্বামী নিয়ে তার অভিযোগের কোন কারণ ঘটেনি — "চিরকাল জীউ মোর সীমা আইহন। অনুপাম বল বীর মতীত্র গহন"।

সে একজন 'রাখোয়াল' ছোকরাকে ভজবে কোন দুঃখে? সুতরাং রাধাকৃষ্ণের কুপ্রস্তাবে চটে গালাগালি দিয়ে মেরে সে বড়ায়িকে তাড়িয়ে দেবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই, না দিলেই অবাস্তব হত। তাছাড়া কাব্যের প্রবাদ প্রবচনের মধ্যেও সেই বাস্তবতার প্রতিফলন মেলে — যেমন রাধা কখনো বিধিলিপিকে এড়াতে না পারার নিরুপায় ক্ষোভে বলে ওঠে — "জুড়ায়িলে সোআদ লাগে তপ্ত দুধ" "চুন বিহনে যেহ তাম্বুল তিতা" - প্রভৃতি প্রসঙ্গের মধ্যেও আমরা বাস্তবতা লক্ষ্য করি। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি অলৌকিকতা মিশলেও তা বাস্তবের বাইরে নয়। মঙ্গলবাক্যগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে"। বাংলাদেশের লোকজীবনের একান্ত বাস্তব ও জীবন্ত পরিমণ্ডল মঙ্গলকাব্যগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদের কথা বাদ দিলে মঙ্গলকাব্যগুলির কোন চেহারাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মঙ্গলকাব্যগুলির দেব-দেবী ভাবনার উৎস লৌকিক, পরে পৌরাণিক প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। তাই এই মনসামঙ্গল, চণ্ডীমণ্ডল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেই লৌকিক প্রসঙ্গ বেশি করে এসেছে। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের দারিদ্র্য, বাংলা লোকসাহিত্যে, গ্রাম্যকথায়, মেয়েলি ছড়ায়, বারোমাস্যা, নারীদের পতিনিন্দা প্রভৃতি প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে লোকজীবনের বাস্তবতা উঠে এসেছে। বিজয় গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণে' চাঁদ সওদাগরের উক্তির মধ্য দিয়ে সমকালীন যুগজীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। সপ্তডিঙা হারিয়ে, মনসার ষড়যন্ত্রে নাস্তানাবুদ হয়ে ভিখারী চাঁদ যখন মজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তখন তিনি চারপন কড়ি পেলে কি করবেন তাও বলেছিলেন —

"একপন কড়ি দিয়া ক্ষৌরশুদ্ধি হব।
একপন কড়ি দিয়া চিড়াকলা খাব।।
একপন কড়ি দিয়া নটীবাড়ী যাব।
একপন কড়ি নিয়া সনকারে দিব।।"

সেকালের লোকসমাজে কড়ির ব্যবহার ও সমকালীন যুগসঙ্কট বাস্তবতাকে তুলে ধরে। মঙ্গলকাব্যগুলি লোকায়িত জীবনের পাঁচালি। আর লোকায়িত জীবন যেহেতু অর্থনীতি নির্ভর সেহেতু মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট জীবন্তভাবে চিত্রিত। বিশেষ করে সমাজ সচেতন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের এক বিশ্বস্ত দলিল। তৎকালীন সময়ে সামাজিক সমস্যার মতো সতীনপ্রথা, পণপ্রথা, সহমরণ প্রথা, ঘর জামাই প্রথা প্রভৃতি বর্তমান ছিল। আর এই প্রভৃতি বর্তমান ছিল। আর এই সবই তৎকালীন বাস্তবতাকে তুলে ধরে। বিবাহ ব্যবস্থায় যে ঘটকালী দরকার হয় সেই বাস্তবতাকে কবি তুলে ধরেছেন কবিতায় —

"ঘটকালি পাবে ওঝা তুমি চারিপন
পাঁচগণ্ডা গুয়া দিব গুড় পাঁচসের,
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের।"

এছাড়া কবি মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের মধ্যে মুসলমান সমাজের আচার আচরণের বৈচিত্র্যও তুলে ধরেছেন —

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচবেরি করয়ে নমাজ।

ফজর অর্থাৎ সকালবেলায় পাটী বিছিয়ে নামাজ পড়ার বিষয়টিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আর এখানেই

সমাজ বাস্তবতা উঠে আসে তাঁর কাব্যের মধ্যে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যেও বাস্তবতা ধরা পড়ে। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারনা থেকে সরে এসে কবি এক নূতন মঙ্গলকাব্য নির্মাণ করলেন। সমকালীন সংকট তাঁর কাব্যের মধ্যে উঠে এসেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি ভয় ভীতিকে আশ্রয় করে দেব-দেবীর নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যগুলিতে মানুষের হাহাকার, খাদ্য সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। এখানকার দেবী অন্নদা হয়ে উঠেছেন অন্নদাত্রী। তাই ছদ্মবেশী অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীকে বরপ্রার্থনা করতে বললে ঈশ্বরী তাঁর "সন্তানকে দুধে ভাতে" থাকার আবেদন জানিয়েছে। বস্তুতঃ সেই সামাজিক সংকট আর বাস্তবতাকে ভারতচন্দ্র নূতনভাবে নির্মাণ করেছেন বলা যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য কবিতায় যেভাবে সমাজ বাস্তবতা উঠে এসেছে, ফুঁটে উঠেছে যুগ-যন্ত্রণার ছবি, ঠিক তেমনি আধুনিক কবিতাতেও আরো বেশি প্রকাশ পেয়েছে শিল্প, আঙ্গিক, বাস্তবতা। যুগে যুগে সময়ের নিরীখে মানুষের চাহিদার যেমন অন্যরূপে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ওরা কাজ করে' কবিতায় সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।"

— একইরকম ভাবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'নবান্ন' কবিতাতেও সেই একই সুর শোনা যায় — "বুকের রক্ত জল করে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা"।

আধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তুতে একেবারে দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া দিকগুলোকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেখানে নিছক ভাব-কল্পনা নয়, রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের স্বরূপ প্রবন্ধে 'প্রাকৃত সত্য', ও 'সাহিত্যের সত্য' - এই দুইয়ের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যের প্রচলিত বাস্তবতাকে নিয়ে ইতালির নোবেল জয়ী সাহিত্যিক লুইজি পিরানদোলা বলেছেন, 'আর্টের নামে আসলে নকল সৃষ্টি করে লাভ কি?' অর্থাৎ আধুনিক কবিদের লেখাতেও সেই বাস্তবতা উঠে আসে। আধুনিক কবি মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' - কবিতায় সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

"নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে
না-ই যদি হয় ক্রোধ
কেন ভালোবাসা, কেন বা সমাজ
কীসের মূল্যবোধ।"

- অর্থাৎ আধুনিক জীবনে ঘটে যাওয়া খুন, ধর্ষণ, সন্তানহারা মায়ের কান্না প্রভৃতি দিকগুলিকে কবিরা তাঁদের কবিতায় নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে বিধির বিচারকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন -

'যে মেয়ে নিখোঁজ, ছিন্নভিন্ন
জঙ্গলে তাকে পেয়ে
আমি কি তাকাব আকাশের দিকে
বিধির বিচার চেয়ে?

সম্প্রতি কৃষ্ণা বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, তাসলিমা নাসরিন, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কবিদের লেখাতেও নারীবাদী ভাবনা তথা নারী অত্যাচারের কথা উঠে এসেছে। শঙ্খ ঘোষের 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়' কবিতাটির মধ্যেও এক বিবাহিতা নারীর শিশু সন্তানসহ নৈরাশ্যজনিত কারণে আত্মহত্যার কথাটি উঠে এসেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে বিবাহিত জীবনে সে অত্যাচারিত কিন্তু প্রতিবাদ করে লাভ নেই বুঝে সে প্রতিবাদহীন নীরব -

"তারপর আটমাসের মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিয়ে যুবতী বধূটিও —"

মনে হয় অনেকদিনই
সে কিছু বলছিল না
ভেবেছে অভাব তো নেই
দড়িরও না কলসিরও না।

পরিশেষে বলা যায় কবিতা বলতে কল্পনার ভাবোচ্ছ্বাস, বা Intense personal emotion আর যে নামই দেওয়া হোক না কেন, যেভাবে কবিতা শিল্পের স্তরে (Surrealism, Realism, Romanticism) উন্নীত করা হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা তাঁদের ভাবনায় সমকালীন যুগ সঙ্কটকেই তুলে ধরেন — একথা বলতে বাধা নেই। তাই প্লেটোর কথাতে কবিদের রাষ্ট্র থেকে, সমাজ থেকে, বিতাড়িত করা উচিৎ, কবিরা ভাবাবেগ নিয়ে আচ্ছন্ন থাকে কিংবা সমাজের পক্ষে বিপদজনক। দেশের লোক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন থাকলে দেশটা রসাতলে যাবে। এই যুক্তি আজকের দিনে নেহাতই টিকে না।

অ্যারিস্টটল তাঁর প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন কবিতা পাঠে পাঠকের মনকে দুর্বল করে না বরং কবিতা পাঠে আমরা সমৃদ্ধ হয়ে, আমাদের মন পবিত্র, নির্মল হয়। কবি বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা দিয়ে এই লেখার সমাপ্তি টানব। কবির চিল্কায় বেড়াতে যাওয়ার অনুভূতি সেই বাস্তবতা স্পর্শ করে —

"কী ভালো আমার লাগল আজ এই সকাল বেলা কেমন করে বলি।
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর। (চিল্কায় সকাল)

- অর্থাৎ সাহিত্যে চোখে দেখা বাস্তবতার কোন অস্তিত্ব নেই, সাহিত্যের কাজ আমাদের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করে তাকে সৃজন করা।

সংকেত ও গ্রন্থপঞ্জী

১) সাহিত্যে বাস্তবতা — আজাহার ইসলাম।
২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — দেবেশ কুমার আচার্য।
৩) কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল — দেবেশ কুমার আচার্য।
৪) সঞ্চয়িতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫) বাংলা কবিতার কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬) নির্বাচিত চর্যাপদ — ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা।
৭) সাহিত্যচর্চা — পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।
৮) বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ সংকলন — কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯) প্রবন্ধ সংগ্রহ — প্রমথ চৌধুরী।

প্রবন্ধ

স্বেচ্ছা রক্তদানে সম্প্রীতি

প্রলয় কুমার সাহা
(কোষাধ্যক্ষ)

"নানা ভাষা নানা মত
নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলনও মহান"।

স্বেচ্ছায় রক্তদান কথাটা শুনলে মনের মধ্যে একটা যেন খুব অসাধারণ অনুভূতি হয়। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রক্তদান মহৎ দান, এর বাইরে কোন ধরনের দান হতে পারে না। কেননা আপনার এক ফোটা রক্ত কোন একজন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারে। রক্ত এমনই একটা উপাদান যা মানবদেহে সঞ্চারণ বন্ধ হলে মানুষের মৃত্যু হয়।

আমি প্রথম রক্তদান করেছিলাম বহরমপুর কলেজে। সেখানে তখন NCC-র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। NCC-র উদ্যোগে একটি রক্তদান কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল ঐ কলেজে। তখন আমি বহরমপুর কলেজে ক্লাস টুয়েলভ ক্লাসে পড়াশোনা করতাম। সেই যে পথচলা শুরু হল আজও চলছে। তখন রক্ত বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতাম না। অর্থাৎ বছরে কতবার রক্তদান করা যায়, কেন রক্তদান করা যায় না, কত বয়স প্রয়োজন, কত ওজন প্রয়োজন ইত্যাদি।

আপনারা যারা রক্তদান করেছেন বা নিয়মিতভাবে করেন তাদের বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি লক্ষ করা যায়। রক্তদান করতে আমাদের তিনরকম অনুভূতি লাগে। সেগুলি কী কী?

(১) রক্তদানের আগে খুব ভয় লাগে। (২) সূচ দেখে ভয় বা ব্যথায় ভয় লাগে। (৩) রক্ত দেওয়ার পর খুব ভাল লাগে ও আনন্দে মন ভরে যায়।

আমাদের প্রত্যেকের জানা দরকার যে, রক্ত দিলে কোন ক্ষতি হয়না। বরং বিভিন্ন ভাবে লাভই হয়। কেননা আপনার রক্তে একজন প্রাণ বাঁচাতে সম্ভব হবে। আপনি অকল্পনীয় তৃপ্তি অনুভব করেন। রক্ত দেওয়ার ২১ দিনের মধ্যে সেটা পূরণ হয়ে যায়। রক্ত দিতে কম করে ১৮ বছর বয়স ও ৪৫ কেজি ওজন হতে হবে। নিয়ম মেনে ১৮ থেকে ৫৫ বছর পর্যন্ত স্বেচ্ছা রক্তদান করা যায়। পুরুষরা বছরে ৪ বার এবং মেয়েরা বছরে ৩ বার নিয়ম মেনে রক্তদান করতে পারে। অর্থাৎ ছেলেরা জীবনে ৪৭ x ৪ = ১৮৮ বার এবং মেয়েরা জীবনে ৪৭ x ৩ = ১৪১ বার নিয়ম মেনে রক্ত দিতে পারে। তাই এই বিষয়গুলি বিভিন্ন মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরি। তাহলে হয়তো আর রক্তের ঘাটতি থাকবে না।

আমরা জানি কৃত্রিম উপায়ে রক্ত তৈরী করা যায় না। অন্য প্রাণীর রক্ত মানুষের শরীরে সঞ্চারণ করা যায় না। একজন মানুষের প্রয়োজনে অন্য একজন না দিলে রক্ত পাওয়ার বিকল্প রাস্তা নেই। সুতরাং আজকের জীবনদায়ী রক্তসঞ্চারণ প্রায় ৪০০ বছরের বৈজ্ঞানিক সাধনার ফসল। তাই ১৮৮৮ সালে রক্ত বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম বছর। কেননা ঐ বছর জেমস্ ব্লাণ্ডেল প্রথম আবিষ্কার করলেন মানুষের রক্তে মানুষের প্রাণ বাঁচবে। ১৬১৬ সালে উইলিয়াম হার্বেন আবিষ্কার করেন মানুষের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। ১৯০১ সালে ডঃ কার্ল ল্যাণ্ডস্টিনার আবিষ্কার করলেন রক্তের ABO গ্রুপ। ১৯০২ সালে আবিষ্কার হল AB। ১৯১৪ সালে

আলবার্ট হাস্টিন আবিষ্কার করলেন — রক্ত + সোডিয়াম সাইট্রেট = রক্ত। ১৯৪০ সালে ল্যাণ্ডস্টিনার ও বিজ্ঞানী ভিনার আবিষ্কার করলেন রক্তের Ph Factor.

মানুষের রক্ত সংগ্রহ করে সঞ্চিত রাখার জন্য তৈরী হল Blood Bank. আমাদের দেশে Blood Bank গুলো তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন — (1) Government Blood Bank (2) Commerical Blood Bank (3) Non Profitmaking Private Blood Bank.

বিশ্বে প্রথম Blood Bank আবিষ্কার করেন ডঃ নর্মান বেথুন (কানাডা) ১৯৩৬ সালে। ভারতে প্রথম Blood Bank তৈরী হয় ১৯৪২ সালে ৬ই মার্চ কলকাতা শহরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে ৮১টি Blood Bank আছে। তার মধ্যে আমাদের জেলায় (মুর্শিদাবাদ) ৫টি। এই Blood Bank গুলোর কাজ হলো — রক্তদাতা সংগ্রহ করা - রক্ত সংগ্রহ - রক্ত পরীক্ষা ও সংরক্ষণ - রক্ত বণ্টন - তথ্য ও নথী সংরক্ষণ - রক্ত সঞ্চারনের পর নিরীক্ষা ও গবেষণা। Blood Bank গুলো বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে রক্ত সংগ্রহ করে নিয়ে আসে এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সাধারণের উদ্দেশ্যে বোর্ডে গ্রুপ করে মোট কত ইউনিট রক্ত তা লিখে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন কারণে রক্তের প্রয়োজন হয়, যেমন — বড় অপারেশন, বড় অ্যাক্সিডেন্টে অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ হলে, প্রসূতির রক্তক্ষরণে, নবজাতকের রক্তরোধে, ক্যানসার রোগের চিকিৎসায়, রক্তাল্পতা রোগে, আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীর চিকিৎসায় এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীর চিকিৎসায় রক্তের প্রয়োজন।

রক্ত না দেওয়ার কারণ ঃ—

ফ্রান্সে শতকরা ৬৪ জন ভয়ে রক্ত দেয়না আর ব্যক্তিগত সমস্যায় ৯ জন দেয়না। সেখানে আমাদের দেশে রক্ত না দেওয়ার কারণগুলো হল — (১) সূচ ও রক্ত দেখে ভয়। (২) অজ্ঞতা। (৩) কুসংস্কার। (৪) পারিবারিক বাঁধা। (৫) কেউ কোনদিন উদ্বুদ্ধ করেনি তাই।

কখন রক্ত দেওয়া যায় না ঃ—

বিভিন্ন কারণে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও রক্ত দেওয়া যায় না, যেমন — (১) টাইফয়েড হলে ১ বছর রক্ত দেওয়া যায় না। (২) ম্যালেরিয়া হলে ৩ মাস রক্ত দেওয়া যাবে না। (৩) কলেরা হলে ১ বছর রক্ত দেওয়া যাবে না। (৪) যার শরীরে রক্ত সঞ্চারণ হয়েছে তিনি ৬ মাসের আগে রক্ত দিতে পারবে না। (৫) মৃগী, হাঁপানী, যক্ষা, একজিমা, হৃদরোগ, মৃগী, কর্মরোগ, কুষ্ঠ, মানসিক রোগী ইত্যাদি রোগী কোনদিন রক্ত দিতে পারবে না। (৬) ডায়াবেটিস, ব্লাড সুগার রোগী ঔষধ খেলে রক্ত দেওয়া যাবে না। (৭) মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা, ঋতুকালীন অবস্থা, সন্তান প্রসবের একবছর, সন্তান মাতৃদুগ্ধ পান করছে এই সময়গুলোতে রক্তদান করা যাবে না।

প্রাণ বাঁচতে জরুরি অবস্থায় অল্প পরিমাণ O গ্রুপের রক্ত যেকোন গ্রুপের মানুষের শরীরে সঞ্চারণ করা যায় বলে গ্রুপের রক্তদাতাকে সর্বজনীন রক্তদাতা বলা হয়। আর একই অবস্থায় AB গ্রুপের মানুষের শরীরে স্বল্প পরিমাণ যেকোন গ্রুপের রক্ত সঞ্চারণ করা যায় বলে AB গ্রুপের মানুষদের সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়। তবে সবসময় সঠিক গ্রুপের রক্ত সঞ্চারনই নিরাপদ।

আমরা জানি উন্নত দেশগুলোতে প্রতি হাজারে ৬০-৮০ জন রক্তদান করে। সেখানে ভারতবর্ষে ১

হাজার জনে ৯ জন রক্তদান করে। যদি ৯ জনের জায়গায় ১১ জন হয় তাহলে চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা পাবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ১০০০ জন ১১ জন, মাত্র ২ জন বাড়ালে চাহিদা মিটে যাবে।

অনেক মানুষ আছেন যারা শিবিরে রক্তদান বিষয়টাকে পছন্দ করেন না। হয়তো তার পছন্দ না করার সামান্য কিছু কারণ থাকতে পারে। তাদের Motivate করতে গেলে বলেন, যদি Direct দেওয়া যায় তবে দেব। কিন্তু বলুন তো আমাদের রাজ্যে প্রতি বছর ১৩ লক্ষ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ Direct কোনভাবেই সম্ভব নয়।

রক্তদানের ফলে এক বছরে আমাদের রাজ্যে সংগ্রহ হয় ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার ইউনিট। সুতরাং ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। আমরা জানি কিছু অসাধু মানুষ এই রক্ত নিয়ে ব্যবসা করে। সব জায়গাতেই এই শ্রেণীর কিছু মানুষ থাকে। তাই আমাদের পিছিয়ে না থেকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। যাতে ঐ সব অসাধু চক্র ভয় পায় এবং আমাদের মহান কাজের কাছে হার মানে। আমরা জানি ভারতে চাহিদা প্রতি বছর ১.৪০ কোটি ইউনিট সংগ্রহ হয় ১.১৪ কোটি ইউনিট এবং সারা পৃথিবীতে প্রয়োজন ১৫ কোটি ইউনিট, সংগ্রহ হয় ১১.২৫ কোটি ইউনিট। সুতরাং আমরাই পারি সারা বিশ্বে চাহিদার ঘাটতি মেটাতে।

কি কি কারণে আমরা রক্তদান করি ঃ—

এই বিষয়টা এমনই যে, ভেতরের অনুভূতি না থাকলে কখনো সম্ভব নয় তাই কারণগুলো হল — (১) কোন একদিন রক্তদাতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। (২) সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে। (৩) অন্যকে উপকার করার বোধ। (৪) ভাল কাজের চেতনা। (৫) জীবন বাঁচানোর তাগিদ থেকে।

আমরা সামাজিক জীব। তাই সমাজে নিজের প্রয়োজন ছাড়া অন্যের জন্য কিছু করতে হয়। যদিও দিনে দিনে ঐ ধারনার পরিবর্তন ঘটছে। তবুও সমাজের কিছু ভাল মানুষ আছেন যারা সব সময় অন্যের ভাল করার জন্য নিজেকে উজার করে দেন। তাইতো আজও এই অরাযোগতার মধ্যেও তারা কাজ করে চলেছে।

এবার আমি আমাদের কলেজের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজ নিয়ে ভাবনা, অপরের ভালমন্দ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য জাতীয় সেবা প্রকল্পের একটি ইউনিট তৈরি হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য সমাজ সেবামূলক কাজ করা। সেই NSS Unit ২০১৩-১৪ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে আসছে, যার মধ্যে রক্তদান শিবির আয়োজন ছিল অন্যতম। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি কলেজের NSS Unit-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছি। যা আমার রক্তদানের সংখ্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে আমি প্রায় ৩৮-৩৯ বার রক্তদান করেছি (সরাসরি এবং শিবিরে)। এবছর ৩১শে মার্চ কলেজে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছি। সেখানে আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বর্তমানে রক্তদান কর্মসূচী একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, NGO, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সারাবছর ধরে এই কর্মসূচী পালন করে থাকে। যার ফলে বর্তমানে রক্তের ঘাটতি অনেকটা কমেছে।

এই সংগঠনগুলি বিভিন্ন বিশিষ্ট দিনগুলিকে সুন্দরভাবে পালন করার জন্য এই কর্মসূচী গ্রহণ করে। যেমন- স্বাধীনতা দিবরস, বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস, শহিদ দিবস ইত্যাদি। অনেকে আবার বিয়ের দিন, জন্মদিন, মৃত্যুদিনকে

স্মরণ করে রাখতে রক্তদান কর্মসূচী পালন করে থাকেন। তবে যে যেভাবেই পালন করুক না কেন, স্বেচ্ছা রক্তদানের বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। একজন স্বেচ্ছা রক্তদাতা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সবার উপরে। কেননা যে যখন রক্তদান করে তখন সে নির্দিষ্ট করে দেয় না যে, কোথায় তার রক্ত দেওয়া হবে। তাই একজন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করার সাহস আমার নেই।

একজন নিয়মিত রক্তদাতা হিসেবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে বিনীত আবেদন অপরের জীবন রক্ষার্থে আপনার একফোটা রক্ত হয়ে উঠুক প্রাণের প্রতীক। সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসুন। ভাগীদার হ'ন এই আন্দোলনের। আমরা যদি জীবনে একবার রক্তদান করি তাহলে আর কোনদিন হয়তো বিশ্বে রক্তের ঘাটতি হবে না। তবে এই আন্দোলনকে আরো কার্যকরী করে তুলতে সরকারিভাবে কিছুটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। রক্ত বিজ্ঞান এবং রক্তদান নিয়ে সাধারণের মধ্যে ধারনা দেওয়া প্রয়োজন। এই কর্মসূচী যেমন রক্তের চাহিদা মেটায়, পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ় করে।

বর্তমানে আমাদের হয়তো এটাই উপযুক্ত সময়ঃ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরী করা। কেননা প্রতিটি মানুষের রক্তের রং লাল। তাই যে দাতা, সে যেকোন জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ হতে পারে পাশাপাশি যে, ঐ রক্ত গ্রহণ করছে সে একই জাতির নাও হতে পারে। সুতরাং এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা একজাতি (মানবজাতি), এক ধর্ম (মানব ধর্ম), এক বর্ণতে উন্নীত হতে পারি এই আশায় রইলাম।

তাই কবির ভাষায় —

"লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন -
প্রভাতের নবারুণ"

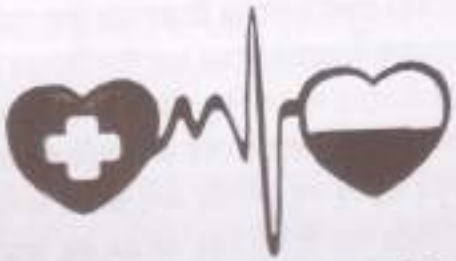

একের রক্ত অন্যের জীবন
রক্তই হোক আমার বাঁধন

প্রবন্ধ

জাতীয় সেবা প্রকল্পে (NSS) আমার অভিজ্ঞতা

মতিউর রহমান

আমি মতিউর রহমান। হাজী এ.কে. খান কলেজের বি.এ. ইতিহাস বিভাগের ৪র্থ সেমিস্টারের একজন ছাত্র এবং এন.এস.এস. ইউনিটের একজন সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবক। এখানে আমি এখন আমার কিছু শব্দের মাধ্যমে আমার এন.এস.এস. ইউনিটে কাটানো কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব। মূল কথাই আসার আগে সর্বপ্রথম আমি আমার কলেজের এন.এস.এস. ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার এম.ডি. ফারুক শেখ মহাশয়কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাই আমাকে একজন এন.এস.এস. ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং তার সঙ্গে আরোও দুজন শিক্ষক অনিকেত সরকার এবং প্রলয় সাহা মহাশয়কেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ধন্যবাদ জানাই, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে আমাদের এই এন.এস.এস. ইউনিটে উৎসর্গ করার চেষ্টা করেছেন সর্বদা।

আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ঃ

সত্যি কথা বলতে একটা সময় ছিল যখন আমার এন.এস.এস. সম্পর্কে তেমন খুব একটা ধারণা ছিল না। আমার শুধুমাত্র এতোটুকুই ধারণা ছিল যে এন.এস.এস. -এর মাধ্যমে বিনা স্বার্থে দেশের জন্য ভালো কিছু করা, সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে, সমাজকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে এন.এস.এস. একটি সেরা ইউনিট।

আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতাটি আমাদের কলেজে একটি সাতদিনের এন.এস.এস. ক্যাম্পের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আমাদের কলেজে প্রোগ্রাম অফিসার এমডি ফারুক শেখ মহাশয়, প্রলয় সাহা, অনিকেত সরকার এই তিনজন শিক্ষক দ্বারা জাতীয় সেবা প্রকল্পের সাত দিনের একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। যেখানে আমরা প্রায়ই ৪৫ জন মত স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীরা আমাদের এই ৪৫ জনকে সে ক্যাম্পে পাঁচটি টিমে বিভক্ত করেন। যেখানে আমার টিমের নাম ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ টিম' এবং আমার টিমের সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী আমাকে আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই সাতদিনের ক্যাম্প এর মাধ্যমে আমি আমার জীবনের অনেক কিছু অজানা বিষয় শিখতে পেরেছি। অনেক নতুন নতুন জিনিস, অনেক ভুলভ্রান্তিকে শুধরে নিতে পেরেছি সেই জন্য আমি গর্বিত। এন.এস.এস. ইউনিটে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমি নতুন নতুন অনেক বন্ধু পেয়েছি এবং আমার অপরিচিত অজানা শিক্ষকমণ্ডলীদের সঙ্গেও আমার একটা ভালো পরিচিতি লাভ ঘটেছে। এই এন.এস.এস. আমাদেরকে একতার সঙ্গে সমাজের কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিখিয়েছে।

এই এন.এস.এস. ক্যাম্পে, আমাদের শিক্ষকেরা এক এক দিন নতুন নতুন কোনোও সংস্থানকে আমন্ত্রিত করে আমাদেরকে নতুন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা দেখেছি বিজ্ঞান মঞ্চের অসাধারণ কেরামতি যার দ্বারা আমরা আমাদের সমাজের সর্বদা পরিলক্ষিত কুসংস্কারগুলি থেকে সতর্ক হতে পেরেছি।

সত্যি কথা বলতে এই সাতদিনের ক্যাম্পের আগে আমার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে তেমন খুব একটা ধারণা ছিল না এখানে যুক্ত হওয়ার পর আমি সাংস্কৃতিক সম্পর্কে অনেকটা ওয়াকিবহাল হতে পেরেছি

সেজন্য আমি আরো একবার আমার শিক্ষকমণ্ডলীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীরা আমাদের সকল স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বদা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে চলার পরামর্শ দিয়ে এসেছেন, আর সেইসঙ্গে সর্বদা আমাদের এটা মনে করে দিয়েছেন যে, শৃঙ্খলা হল এন.এস.এস. -এর মূল বিবেচ্য বিষয়। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে আমি অনেকটা সাহসী হতে পেরেছি সকলের সামনে কিছু প্রতিস্থাপিত করার বিষয়ে। যেখানে আগে স্টেজে যাওয়ার মতো আমার কোনোও সাহস ছিল না, এই এন.এস.এস. -এর মাধ্যমে আমার সেই ভয়টিকে বিনাশ করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী সর্বদা আমাদের সাহস যুগিয়েছেন ভালো কিছু করার জন্য। শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনারা আমাদের যত্ন নিতে ভুলে যাননি বরং আমাদের সঠিক সময়ে ঠিকমতো মধ্যাহ্নভোজ এবং আরো কত কিছু ব্যবস্থা করিয়েছেন।

এই ক্যাম্পে আমাদের পাঁচটি টিমের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুমুল প্রতিযোগিতা হলেও আমাদের মধ্যে ছিল একতা এখানে কেউ জয়ী বা বিজয়ী হওয়ার কারণে আমরা কেউই কাউকে হিংসা, বিদ্বেষ করিনি, বরং আমরা ভিন্ন ভিন্ন টিম থেকে হলেও আমরা একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরাও এটাও পরিলক্ষিত করতে পেরেছি যে যখন একটি টিমের সদস্য এসে তাদের কে সাজিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে তাদের অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করে দিয়েছে, আর যেটি আমাদের এন.এস.এস. -এর উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছে।

সবার শেষে এটা না বললেই নয় এই ক্যাম্পের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া একজন বিশেষ মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে তাকে আবারও হারিয়ে ফেলেছি।

আমার জীবনের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ঃ

জাতীয় সেবা প্রকল্প আমার জীবনের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রাজা এন.এল.খান ওমেন্স কলেজে আয়োজিত একটি সাতদিনের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে। যেখানে এই বৈচিত্র্যময় ভারতের ১৮টি ভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রায় ২১০ জন স্বেচ্ছাসেবকদের সমাহার ঘটেছিল। আর যেখানে আমার মত একজন সেখানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল। সেই জন্য আমি আবারও আমাদের কলেজের এন.এস.এস. ইউনিটে প্রোগ্রাম অফিসার এমডি ফারুক শেখ মহাশয়ের কে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই অনুষ্ঠানটি ২৫-৩১শে মে, ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি এক ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ক্যাম্পটিতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে জীবনের অনেক কিছু শিখতে পেরেছি যেগুলো হয়তো আমার কাছে অজানা ছিল। সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো সেখানে আমাদের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটেছে যেখানে আঠারোটি বিভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটে। এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমি অনেক দূরের নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে চাই যে কলেজটিতে আমরা গিয়েছিলাম কলেজটির ক্যাম্পাসটি ছিল খুবই সুন্দর। ক্যাম্পাসটি আয়তন ছিল প্রায় ৪৮.৮২ একর এর মত, যেটি সুন্দরভাবে ফুল গাছপালা দিয়ে সজ্জিত। এখানে আমরা যে অডিটোরিয়াম রুমে বসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিকে দুচোখ ভরে দেখতে পেরেছি সেটির সৌন্দর্য বর্ণনা করার মত ভাষা হয়তো আমার জানা নেই।

এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে নতুন কোন এক অপরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে হোস্টেলে বসে আড্ডা মারা,

একসঙ্গে শব্দের আওয়াজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একসঙ্গে খেতে যাওয়া, সেই ভোরবেলায় একসঙ্গে ঘুম থেকে উঠে করতে পঞ্চমতম দিনে একসঙ্গে বসে করে দীঘায় পিকনিক করতে যাওয়া, এ সমস্ত মুহূর্তগুলো আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেখানে একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় ছিল এই যে আমরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত বন্ধুরা মিলে ইংরেজি ভাষায় আড্ডা দিতাম যে মুহূর্তেটি মনে পড়লে আবারো ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে সেই দেশে। এই ইন্টিগ্রেশন ক্যাম্পটির দ্বারা নিজের কাজকে, নিজের জিনিসকে কিভাবে ঠিকঠাক মত গুছিয়ে রাখা। কিভাবে নিজের কাজকে ভালবেসে করতে হয় সেটাও শিখতে পেরেছি।

আমি উপরিক্ত আলোচনায় যা কিছু বললাম যদি কোনোও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। উপরের আলোচিত অভিজ্ঞতাগুলি হয়তো আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার কয়েকটি শব্দ মাত্র।

প্রবন্ধ

করোনা ভাইরাস

মিঠুন সেখ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে মানুষ নিজের প্রখর বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, জীবন লাভ করেছে এক অনন্য মাত্রা। সভ্যতার জয়যাত্রার পথে মানুষ আজ ভূগর্ভ থেকে মহাকাশ পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্য যে পৃথিবীর বুকে সভ্যতা যতই জাঁকিয়ে বসেছে, ততই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের জীবনের নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ। ভিন্ন ভিন্ন যুগে জীবনের এই প্রতিকূলতার রূপও ভিন্ন ভিন্ন। কখনো আঘাত আসে ভূমিকম্প, বন্যা বা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ রূপে; কখনো বা পৃথিবীর বুকে কোন মহাজাগতিক বস্তু আছড়ে পড়ার আশঙ্কায় মানুষ ভোগে অস্তিত্ব সংকটে; আবার কখনো কোন মারণরোগ কিংবা মহামারীর আগমনে। বিশ্বব্যাপী প্রাণসংহারী এই মহামারীর তালিকায় নবতম সংযোজন করোনা ভাইরাস।

করোনা ভাইরাস এর উৎস সম্পর্কে পৃথিবী জুড়ে আজও সমূহ বিতর্ক বিদ্যমান। কারোর মতে এই ভাইরাস কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে তৈরি; আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই ভাইরাসের উৎস হলো বাদুড়। তবে কোন মহলই এই ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। যে একটি ব্যাপারে মোটামুটি সকলেই নিশ্চিত তা হল এই ভাইরাসের গ্রাউন্ড জিরো। অর্থাৎ এর সংক্রমণ সর্বপ্রথম কোথা থেকে শুরু হয়েছিল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয় চীন দেশের হুনান প্রদেশের রাজধানী উহান শহরের একটি মাংসের বাজার থেকে। সেখান থেকেই এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে এক বিশ্ব মহামারী আকার ধারণ করে।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে করোনা এবং ভাইরাস দুটি শব্দই লাতিন ভাষা থেকে গৃহীত। করোনা শব্দের অর্থে মুকুট বা crown এবং ভাইরাস বলতে বোঝায় একপ্রকার অকোষীয় আণুবীক্ষণিক রোগ সৃষ্টিকারী বীজাণুকে যার আক্ষরিক অর্থ হল 'বিষ'। ভাইরাস জীবগোষ্ঠীর অন্তর্গত নাকি জড়, সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। তাই ভাইরাসকে একটি রোগ বহনকারী বীজাণু রূপে ধরে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে, আমাদের আলোচ্য ভাইরাসটির নাম করোনা হওয়ার কারণ হল এর আকৃতি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এ পর্যবেক্ষিত এই ভাইরাসটির শরীরজুড়ে খাঁজকাটা অসংখ্য কন্টক একে আপাতভাবে একটি রাজমুকুটের আকার দেয়। এই ভাইরাসটি ভাইরাসগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় আয়তনে বেশ খানিকটা বড়। এটি ডায়ামিটারে ০.০৬ মাইক্রন থেকে ০.১৪ মাইক্রন বা গড়ে ০.১২৫ মাইক্রন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

করোনা ভাইরাস এই পৃথিবীর রোগের দুনিয়ায় নতুন নয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব চিহ্নিত হয়। তারপর থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মানুষের শরীরে রোগ বহনকারী প্রায় পাঁচ প্রকারের করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়। এই ভাইরাস মানুষের শরীরে বাসা বেঁধে মূলত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশেষ জটিলতার উদ্রেক ঘটায়। কিন্তু যে করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা, তা পুরনো করোনা ভাইরাস থেকে বহুলাংশে পৃথক এবং সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির। যার ফলে প্রথম থেকেই একে চিহ্নিত করা হচ্ছে নোভেল করোনা ভাইরাস নামে। ২০১৯ সালের শেষ দিক থেকে চীনে এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যায়। মিউকাস এর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এই ভাইরাসটি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করে। এক্ষেত্রেও প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে মানুষের শ্বাসযন্ত্র।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কোভিড-১৯ এর নির্দিষ্ট চিকিৎসা বলে কোন কিছু নেই। উপসর্গ অনুযায়ী এর চিকিৎসা হয়ে থাকে। তাই এই ভাইরাস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল ভ্যাক্সিনেশন বা টিকাকরণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে প্রধানত মানুষে মানুষে সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রথাকে বোঝানো হয়। এই নিয়মের পালনের নিমিত্তই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বারবার বিশেষ ধরনের মাস্কের ব্যবহার এবং হাত পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে ৭০ আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল দ্বারা তৈরি স্যানিটাইজার তথা সাবান ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও তারা জানিয়েছেন সংক্রমণ চলাকালীন বিশেষ প্রয়োজন এবং মাস্ক ছাড়া বাড়ির বাইরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। তা না হলে করোনাভাইরাস কে প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সব শেষে বলা যায় সভ্যতা যখন নিজের গতিকে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করে, সৃষ্টি তখন সমগ্র সভ্যতাকে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। একটি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ভাইরাস যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতাই প্রমাণ করে দিল। আবারো আমরা দেখতে পেলাম সৃষ্টির কাছে আমরা ঠিক কতখানি অসহায়। তবে মানুষের এই অসহায়তায় প্রকৃতি বিশ্বজুড়ে দূষণকে কমিয়ে বায়ুকে আবারো বিশুদ্ধ করে তুলেছে ধীরে ধীরে। লকডাউনে শুনশান হাইওয়েতে বন্য নীলগাইয়ের চরে বেড়ানো এই দুর্যোগের পরিস্থিতিতেও আমাদের মুগ্ধ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে করোনা ভাইরাস পরবর্তী পৃথিবী আর আগের মতন থাকবে না। মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও হয়তো আসবে জন্য স্থায়ী পরিবর্তন। তবে একথা সত্যি যে এই দুর্যোগের মেঘ কাটিয়ে উঠে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আবার সুস্থ পৃথিবীতে শ্বাস নিতে পারব।

Harharpara, West Bengal, India
Google

A.K. KHAN COLLEGE
DEPARTMENTAL LECTURE SERIES
Gender
in India

"আমরা যা এবং ভবিষ্যতে আমরা যা হবো তার জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের নিজেদের মধ্যে শক্তি আছে, আমাদের নিজেদের তৈরী করার জন্য। আমরা এখন যা হয়েছি তা আমাদের অতীতের কর্মের ফল, আমরা ভবিষ্যতে যা হবো তা আমাদের বর্তমানের কাজেরই ফল হবে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে কিভাবে আমরা আমাদের কাজ গুলো করব।"

স্বামী বিবেকানন্দ